পঁচিশ জন সাম্প্রতিক কবি

সম্পাদনায়

দিনেশ দাস
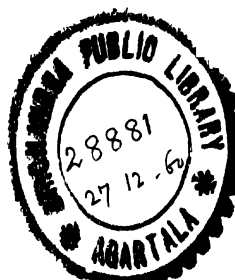
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-বারো

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রকাশনায় :
মৃণাল দত্ত
এ ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-বারো

মুদ্রণে :
জিতেন্দ্রনাথ বসু
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩।১, মোহনবাগান লেন
কলিকাতা-চার

প্রচ্ছদ অঙ্কনে :
বিভূতি সেনগুপ্ত

কভার ব্লকে :
ক্যালকাটা ফটোটাইপ ষ্টুডিও

প্রচ্ছদ মুদ্রণে :
দি নিউ প্রাইমা প্রেস

॥ ৪.০০ ॥

সময়ের স্রোত তীব্র জেনেও পিছনে তাকাই। এখানে আর এক
ভরা যৌবন সন্ধ্যা ব্যাকুল,
অভিমানি চোখ ছলো ছলো হয়ে বাজায় বেদনাবেহাগ।
এবার
সব ব্যথা আমি জাগর রাতের গানে গানে ভ'রে দেবো; বেদনার
এই গান তুমি এসেছ যখন নিয়ে যাও ভাই সারা পৃথিবীর
প্রাঙ্গনময়
ছড়াতে।
গানের একটি-ও কলি কোন হৃদয়ের গভীর গহনে
যদি হয় ফুল,
ফুল হয় শেষে শান্তি-শিশির, তাই চাই আমি। আর সব ফাঁকি।
আর সবই ভুল।

স্বর্ণবীজ

তৃষ্ণার্ত শান্তির স্বচ্ছ দীঘি ভরা জল কোথায়, কোথায় বলো?
বহ্নি-ছোঁয়া জীবনের ধূ ধূ বালিয়াড়ি
আদিগন্ত ছেয়ে আছে।

নিয়মের অনুজ্জ্বল বিষণ্ণ রুটিন
যেমন সরালো হাত, তোলো জনহীন
পৃথিবীর কোন এক সবুজ প্রান্তের গান; দিতে হ'লো পাড়ি
তাই শেষে বন্দরের চোখে দোলা করুণ কুজ্ঝটি মাখা ছবি
সময়ের বুকে রেখে। স্মৃতি-ভেজা মাঠ বন ছুঁয়ে ছুঁয়ে
এখানে এলাম।

বৃষ্টির অশ্রান্ত সুরে মায়াবী সময়
পাথরে বাঁধানো তীর ভেঙে ভেঙে বয়ে চলে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে
কল্লোলিনী হয়।

দিনের বিষণ্ন ক্লান্তি মুছে ফেলে, ভাটিয়ালী গান গেয়ে
আকাঙ্ক্ষার তরী
পাল তোলে। যোজন যোজন ছাওয়া সবুজ কাশের বন,
ধানের মঞ্জরী
আনমনে ছুঁয়ে ছুঁয়ে হঠাৎ কখন
হয়তো ছুঁতে-ও পারো মমতার মতো স্নিগ্ধ বাংলার শ্যামল নীলে
স্মৃতি-ভেজা মন,—
যে-মন উজ্জ্বল করে, যে-মন পবিত্র করে অবিচিত্র রাত্রি
আর বিবর্ণ দুপুর
স্বপ্নের কোরক-গন্ধে। বিমুগ্ধ কলাপী ওই বৃষ্টির নূপুর
সমস্ত রাত্রির কানে অবিরাম এক-ই নাম ঘুরে ঘুরে বলে।

তবু এত আয়োজন
সব বুঝি ব্যর্থ হলো। বৃষ্টি শেষ। রাত্রি ভোর। কোথায়
সে মন!

ধীরে ধীরে সূর্য জ্বলে। সমুদ্রের রোল ওঠে গলির কোনায়—
গ্রাম-ছায়া, মন-মায়া ভুলে গিয়ে নদীর রুপোলি রেখা
সমুদ্রে মিলায়।
তারপর রূঢ় রৌদ্রে ব্যস্ত কোলাহল।
চোখ ছেপে নামে ওকি ?—চুপ্, চুপ্। কিছু নয়।
দুই ফোঁটা জল!

সুনীলকুমার নন্দী

তোমাকে ভুলবো না

মায়াবী রাত্রির প্রতিশ্রুতি সখি, হয়তো রাখা আর
হলো না।
বারোমাস তীব্র বৈশাখী ঢালিছে রুক্ষতা
অভীপ্সার বীজ ছড়ানো প্রান্তরে, আকাশ-গঙ্গার
বুকতো বালুশেজ ; ছিন্ন মেঘমালা ; শ্রাবণী রূপকথা
ভুলেছে রিম্‌ঝিম্‌ কাজরী মূর্ছনা ; স্বপ্ন-মঞ্জরী
তাই তো খাঁ খাঁ মাঠে দোলে না।
ঘরে যাবো বেদনা-জর্জর
দিনের শূন্যতা জড়িয়ে বুকে-মুখে! ব্যাকুল বিভাবরী
প্রতীক্ষার দীপ জ্বালিয়ে ব্যথাতুর করো না।
যাযাবর
পথের ইশারায় হৃদয় উন্মনা,—নীলাভ তারা গোনা
সোনালি অবকাশ আসে নি কতোকাল! সবুজ ঘন ঘাস
বিছানো শয্যায় রাত্রি ভোর হবে।
মেঘের আল্পনা.
পাহাড়ী নদী-হ্রদ দিতে-ও পারে বুকে। স্নিগ্ধ আশ্বাস
বৃষ্টি ঝরে যদি বন্ধ্যা প্রান্তরে তুলবে ভীরু সোনা
স্বপ্ন-মঞ্জরী। তখন ডেকো সখি, তোমাকে ভুলবো না।

জানবে না

কেউ জানবে না
কী এক অস্ফুট ব্যথা বুকে নিয়ে নানা কাজে হৃদয়ের
অনাত্মীয় দু'দিনের চেনা
কোলাহলে দিন যায়। রাত্রি নামে ঘুম-বিজড়িত চোখে।

আবার প্রভাত

ঘুমের শিয়রে এসে ব্যস্ততার হাত
যেই রাখে নিয়মের একই বৃত্তে পথ-পরিক্রমা
সুরু হয়। ব্যতিক্রমে সমস্ত মুখর কণ্ঠ এক সুরে
ধিক্কার দেবেই শুধু; ক্ষমা
নেই, নেই জীবনের বাঁধা ছন্দ ছিন্ন হ'লে জানি,
তবু চুপি চুপি বলি, শোন—
মৃত্তিকার স্পর্শলাগা সবুজ গাছের ঘন ছায়ায় কখনো
ব'সে যদি পাখির কূজনে ভরা শান্তবহ স্রোতস্বিনী জলে
একান্ত নিবিড় স্বপ্ন আনন্দ-বেদনামিশ্র প্রাণের কল্লোল শোনা
না-ই যায়, জীবন তাহলে
কী নিয়ে বাঁচবে বলো ?

ঘুমভাঙা রাত্রিভোর শূন্যতার জ্বালা
চোখে জ্বলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে স্মৃতি দৃশ্য : মা'র কোলে
মাথা রেখে শুভ্র মেঘমালা
শৈশব-স্বপ্নের কণ্ঠে পরানো। এই তো ক্লান্ত ম্লান
জ্যোছনায়
সে-সব স্বপ্নের ছবি পুড়ে পুড়ে কোথায় মিলায় !

প্রার্থনা

কর্কশ রৌদ্রের শেষ। শ্রাবণী শিল্পীর শিল্প মেঘের পাহাড়
ভেঙে ভেঙে, ইন্দ্রনীল ছড়িয়ে উজ্জ্বলতম ঘনিষ্ঠ আশ্বিন
এলো কি ?—রৌদ্রের স্নিগ্ধ স্বপ্নের আভাস ইতস্তত, আর
হাওয়ার আঁচলে ভাসে শস্য-মঞ্জরীর ঘ্রাণ।

সুনীলকুমার নন্দী

সমুদ্রের কণ্ঠলগ্না চেতনার বীণ
করুণ রাগিণী তোলে—
সমুদ্র-আশ্লেষ থেকে আমাকে বিমুক্ত করো, করো
মুক্তপাণি। মুক্তোর সন্ধানে মন ভাদ্রের রোদ্দুরে ভিজে
সমুদ্র-অতলে
সারাদিন হেঁটে হেঁটে কী পেলো! মৃত্যুর মতো রিক্ত
অন্ধকার বুকে কাঁপে থরোথরো
রাত্রির শিয়রে গিয়ে। তবু-ও ছলনাজাল বোঝে না
ডুবুরি মন। কতো না সময়
অশান্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হয়েছে শিকার
এম্নি অকরুণ দ্বন্দ্বে।
আর নয়। একান্ত মিনতি রাখো,
ভীরুর আশ্রয়
ছিন্ন করো। ছিন্ন করে আমার অতৃপ্ত মনে তন্ময় সত্তার
ঢেলে ঢেলে সৃষ্টির প্রেরণা দাও
জীবনে। শিশির-ভেজা প্রান্তরের গান
আজো তো ভুলি নি আমি, সমুদ্রের লোনা জলে কখনো উধাও
হতে পারে স্মৃতি-সোনা!
মুহূর্তের বিপর্যয়ে আত্মার পবিত্র রাখি
মুগ্ধ আশ্বিনের অভিজ্ঞান
বিলুপ্ত। নিষ্ঠুর লগ্ন অতিক্রমি নিয়ে চলো শস্যের মঞ্জরী-ভারে
আনত প্রান্তরে; হবে বোনা
নবান্নের স্বপ্ন-ছোঁয়া গানের হারানো কলি। তোমার ঐশ্বর্য-ধন্য
আমার আশ্বিন আর ব্যর্থ হতে
দিয়ো না, দিয়ো না।

অমর ষড়ংগী

(১৯৩১)

অনুভব

সে যদি অপরিহার্য তবে কেন মন
বার বার নিরুত্তর ? জাফরানী পড়ন্ত বিকেলে
রোজ রোজ যায় আসে, প্রাকৃত ভাষণ !

ধানকাটা শেষ হলে আদিগন্ত মৌন-শূন্যতায়
অসহ্য ক্লান্তির বোঝা, প্রগাঢ় আঁধার—
নরম সহজ এক শান্তি আনে দেহের সীমায়।

ভালোবেসে অন্তরঙ্গ, তার নাম স্বপ্নে মনে হয়
তুই আত্মা অবিচ্ছিন্ন সে নারী অসূর্যম্পশ্যা নয়।

এক আকাশ তারা

অনেক অনেক শান্তি। এক আকাশ তারা
খোলা ছাদে শুয়ে দেখি, যে আঁধার সেই তো আলোক।
তন্ময়তা উপজীব্য। একই প্রেম দ্যুলোক ভূলোক
পরিব্যাপ্ত কালপুরুষ, সপ্তর্ষি, ক্যাসিওপিয়ারা।

রহস্যে আবৃত স্মৃতি। জন্মদাতা সৃষ্টির প্রধান
কখনো হাওয়ায় মত্ত ; কখনো বা রাতজাগা পাখি।
সুরে সুরে এক সত্বা। অপরিশোধ্য ঋণ বাকী
নীল আকাশের নীচে। শিশিরের বিন্দু দিয়ে স্নান……

অময় ষড়ংগী

গাছ, পাতা, ঘাস আর সবুজ প্রকৃতি
অসীম বিশ্বাসে পুষ্ট। আমার উদাস দৃষ্টি, মন
হাওয়ার শব্দই শোনে, তারা গোনে। রীণার যৌবন
সত্য বলে মনে হয়। এখন সে ঋতুমতী নদী।

ছেড়ে এসে

আলোর জগৎ থেকে অন্ধকারে এলাম যদিও
মনে মনে ভয় নিয়ে। সামান্য আশ্বাস দিয়ে তাও
বলেছিলে ঃ ফিরবোই। কতইবা দেরী হবে আর
সময় তোমার টানে আনবোই সুরের ঝংকার।

তবুও পাইনে শান্তি। শূন্য ঘরে দরজা ভেজিয়ে
নিঃসঙ্গ আগুন জ্বেলে এ্যালবাম মিথ্যে হাতড়িয়ে
ফটো খুঁজি। তাল-খেজুরের বনে চাঁদের আঁচল
জড়িয়েছে সাত প্যাঁচ। সাঁওতাল পল্লীর মাদল
শোনা যায় দূর হতে, করুণ কেমন যেন লাগে
নারী আর পুরুষের নৃত্যের প্রগাঢ় অনুরাগে!

যে আকাশ নীল ছিল সেখানে ধূসর ছায়া পড়ে।
তারকার শতদলে তোমার নামের প্রান্তে নড়ে
আলোক-লতার মতো। তার দিকে মুখ রেখে মন
ভাবনার স্রোতে ভাসে, সে বসে কি করছে এখন!

হয়তো বা খোলাচুলে ছাদের কার্নিসে ঠেস দিয়ে
উড়ন্ত স্মৃতির খেলা চেয়ে দেখে সব ভুলে গিয়ে।

কাঁদবোনা

কাঁদবোনা আর আমি পৃথিবীর মাটির ওপরে
ভীরু বালকের মতো অন্ধকারে, কাচ-ভাঙা স্বরে
পাই বা না পাই তাকে লোনা জল আর
ফেলবোনা, জাগাবোনা মাটি-মনে তীব্র হাহাকার।

প্রেম আর ভালোবাসা বহু দুঃখ তপস্যার ফলে
আসে এই জীবাশ্রয়ে, সাধনার নীলাভ ইজেলে
গোপন সে ছবি আঁকা। তাকে কি সবাই
জলের সহজে পায়? সবি কি সাধনায় মেলে?
লক্ষ্মীকে পাইনি আমি, বাণিজ্যেতে অলক্ষ্মী পেয়েছি
তাকে নিয়ে যাব দূর—সর্বনাশের কাছাকাছি।
সেই ভালো, সেই থাক, ভেসে যাক আমার প্রার্থনা
ম্লান মূঢ় স্তব্ধতায় তবু আমি আর কাঁদবোনা।

তার চেয়ে পৃথিবীর আঁকাজোকা গল্পের শহরে
আমি থেকে যাবো এক গল্প হয়ে মধ্যবিত্ত ঘরে।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

(১৯৩২)

অভাজন

পৃথিবীর অভাজন এক ব্যক্তি আত্মগত বলে
নিজের সর্বাঙ্গ দিয়ে খেলা করে, নিজেকে দ্বিতীয়
যন্ত্রণার জন্মদানে আনন্দের লগ্নে করে প্রিয়—
একভাবে চিরদিন চলে, পথ চলে······

উচ্ছিষ্ট কুড়োতে থাকে কার যেন ফেলে-দেওয়া ফুল,
গির্জার ঘণ্টার শব্দ, বিয়েতে সানাই কার, চন্দ্রালোকে বাঁশি
কানে শোনে, শ্যাওলার গুঁড়ো মাখে সবুজ রঙের সমতুল,
সঞ্চয়ের ঝুলি ভরে তুলে নেয় পরিত্যক্ত বস্তু রাশি রাশি ;

এ-সকল সামান্যের অবদানে তার দেহ ভরে ঃ
কেবল গানের মত মন্ত্র মনে পড়ে
যে-মন্ত্রে উজ্জ্বল ছিল উদ্বুদ্ধ প্রেমিক তারই মন,
প্রাণশব্দে ভরা ছিল ভুলে থাকা নীরব নির্জন—

অজানিত কবে থেকে বাজে সেই পূর্ণতম বাঁশি
সমস্ত প্রকৃতি তার দিকে থেকে বলে ভালবাসি, ভালবাসি ॥

বিষবৃক্ষ

নখে টিপে মেরে ফেললে হে প্রাণপ্রয়াসী
তোমার বায়সকণ্ঠ অশুভ অশুচি অন্ধকার—
সৃষ্টির নিগূঢ় স্বপ্নে গভীর হৃদয় বনবাসী

শাখা-ছায়া-ফুলে-ফলে গড়ে এক সুন্দর প্রাকার…
মনে পড়ে কাকে যেন ফুল দিয়েছিলে
ভাসালে নদীর জলে বাসনায় ভরে-দেওয়া দীপ
মুকুরে নিজের মুখ দেখতে দেখতে পার হলে দ্বীপ-অন্তরীপ
নিজের রক্তের নদী কোন মুখে ফিরিয়ে যে দিলে…

তোমারই এ-মানচিত্রে সৃষ্টির বিন্দুতে
ভাবো ফোটে ফুল ভাবো তারা ফুটে ওঠে
যেন গৃহস্থালী গড়ে খড়কুটো এনে ঠোঁটে ঠোঁটে
তোমার মনের পাখি রক্তপিণ্ড প্রাণময় ছুঁতে নাই ছুঁতে—
জানো না বায়সকণ্ঠ মরে না, বিষের গাছ ঠিক
যতবার কাটো ছাখো ততবার ব্যাপ্ত করে আছে দিগ্বিদিক ॥

ভুল ভালোবাসা

ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে ঘরে
সে যদি আবার সেই ম্লানতার ছবি খুলে দেখে
যা রয়েছে বুকে তার শয়নে জাগ্রতে শীতে জ্বরে
যাকে মনে রেখে তার অন্য সবই গেছে একে একে—
তার সেই নীল চোখ প্রসন্ন উদাস মায়াময়
ছেলেবেলাকার মনে আশ্চর্য কঠিন ভালোলাগবার মত,
চেখে কিংবা চোখে দেখা যে-তন্ময় হয়েছে মন্ময়
মুখরাখা সভ্যতায় কেন তাকে করো ফের দুঃখভারানত ;

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

তাকে কেন ভাবলে চোর, কেন ভাবো শস্যময় ক্ষেতে
মশালে আগুন জ্বেলে দস্যুর মতন একদিন
সেও আসবে দ্রুতপায়ে একান্ত কঠিন
তোমার সোনার রাজ্যে দুটি ক্ষুদকুড়ো শুধু পেতে—
কেন বা ভিখিরী ভাবো তোমার দ্বারের কাছে বলে,
হৃদয় তোমারও আছে একথা সে সাধারণ জানে—
অথচ তাকেই তুমি কাকতাড়ানোর মত কালো ছেঁড়া কাঁথায়
চুণকালিমাখা হাঁড়ি দিয়ে ভয় দেখিয়েছ হেসে মনেপ্রাণে ;

পরাজিত সব ক্ষেত্রে হয়ত সে তুমি যা যা জানো
আশ্চর্য প্রক্রিয়া কত আনন্দের তুমি মনে রাখো
কী ভাবে নিজেকে ভুলে অন্যকে ভুলিয়ে পথে আনো
এবং পথের প্রান্তে জ্যোতিষীর ছক-দাগ আঁকো—

দেখো সে আরেক দিকে দাঁড়িয়েছে বকুলের মত
যেখানে এসেছে ফিরে তার মালা গাঁথবার স্মৃতি
যেখানে খঞ্জনীবাদ্যে বাউলের উদাসীন গীতি
ফেলে আসে অন্য সত্য, মিথ্যা আজ যাকে তুমি বলো অবিরত—

বুক যদি খুলতোই সে দেখা যেত শিরাউপশিরা
সুন্দর নদীর মত বারবার পথ ভুল করে,
ভুলের আনন্দ নিয়ে বেজেছে মন্দিরা—
যতক্ষণ ভুল শুধু ততক্ষণ তার মন ভরে।

অপ্রেম

যখন ঘুমোলো সে-ও অন্ধকারে একা
তখন অদৃশ্য হল তার দেহজ্যোতি—
অন্ধকার জানোয়ার মুহূর্তেই দিল তার দেখা
এবং শুকিয়ে গেল প্রাণধারাপূর্ণ স্রোতস্বতী ;

সে তখন প্রেম নয়, গান নয়, নয় ভাল কিছু ঃ
পৃথিবীর গন্ধময় ভালোবাসা, রক্ত অনুরাগ,
সাগরের নীল ছায়া ; নীল আবহাওয়াটার পিছু
ঘুরেও পেল সে ব্যথা হৃদয়েতে দুখণ্ড দুভাগ—

এমন কি যে তাকে কিংবা যারা যারা ভালোবাসতো তাকে
তার জাগরণে যেন মুহুর্মুহু শান্তি পেত ঘুমে—
তারাও মোমের মত ব্যর্থ অবয়ব নিয়ে হাঁকে,
যে হাঁকে শুকোয় মাঠ পরিপূর্ণ হরিত গোধূমে ;

সে যখন ফিরে এল জেগে জেগে, জ্ঞানপাপী তখন অচেনা,
অর্থ বিত্ত বহু তার তবু পূর্ণ অপ্রেমের দেনা

এক নদী, এক নারী

এ-নদী ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সেই আত্মঘাতিনীকে—
এ-নদী নারীর কত ক্রূর এক ঈর্ষার দংশনে
জ্বলেছে ; ডেকেছে এক নীলছায়া মায়াবী প্রতীকে,
জলের কোমল স্পর্শে ; সাজিয়ে রেখেছে অভিসন্ধি
গূঢ় কোণে—

ও জানে অনেক কথা ঃ ওরই পাড়ে কত প্রতিশ্রুতি
নির্জনে দুজনে এসে বালির ওপর গেছে লিখে,
হাওয়ার গভীর সুখে মেলে দিয়ে সব অনুভূতি
আশ্চর্য পাখির মত চেয়েছিল পরস্পর দুজনের দিকে—

এমনি এক উপাখ্যান বুকে নিয়ে বয়ে চলে নদী,
বিজয়িনী হাসতে থাকে চিরকাল উচ্ছ্বাস-আকুল
যতদূর দৃষ্টি চলে এপার-ওপার সেই দিগন্ত অবধি,
মাঝে মাঝে ছিটকে ওঠে ফেনাভরা তরঙ্গের ফুল···

এ-নদী জয়ের গর্বে আঁকড়ে আছে সেই এক পুরুষের মন
যে-লোক পাগল হয়ে দুঃখশোকে ওরই পাশে করে বিচরণ

হৃদয় ফাঁকির ঘর

কেবল সতর্ক থাকি। ছিন্নভিন্ন, অনন্যসম্বল,
নিরুপায় সব ক্ষেত্রে তাই এক কেন্দ্রে আত্মগত—
সমুদ্রের ব্যবধান বিস্তৃত নদীর পারাপারে—
এবং শোণিতশিরা, মজ্জা, গ্রন্থি, স্নায়ুতন্তু, হাড়ে
হাওয়ার বদলে ক্ষান্তবর্ষণের পীড়া এক জেগেছে নিয়ত,
হৃদয় ফাঁকির ঘর সেইখানে বড় করে যায় অবিরল···

যে-ছায়া পড়েছে ঘরে যে-ধ্বনির প্রতিধ্বনি আছে
সমস্ত যখন এসে একযোগে করে চলাচল,
জানালাতে পর্দা এঁটে ভাবি নেই ওদিকের গাছে
সূর্যের শেষের রশ্মি চূর্ণ করে দিতে এক স্থবিরের
আঁধার অতল,

বৃদ্ধি পায় রক্তচাপ যৌবনবিক্ষুব্ধ মনোবল,
হৃদয় ফাঁকির ঘর বড় করে যবে তারই মাঝে···

বজ্রবন্ধনের গ্রন্থি ভাবেনি যে তারও ফাঁকি থাকে ঃ
মনের ফাঁকিতে এসে জড়ো যেন হয় সব মাছ
বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন যারা লবণাক্ত অশ্রুজলে, কাচ
হয়েছে দুচোখ যার, শরীর শীতল কাদা মাখে ;
বিশ্বাসঘাতক মন ভ্রষ্টাচারে কি আনন্দ পাবে,
হৃদয় ফাঁকির ঘরে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে পুরনো সংরাগে !

প্রফুল্লকুমার দত্ত
(১৯৩২)

জীবন্মৃতের যুগ

প্রকৃতি, অজস্রবার ক্রমবিবর্তনে
হঠাৎ নিরস্ত তুমি এ-কোন পর্যায়ে ?
জীবন্মৃতের যুগ ; নির্বহতা নদী ঃ
খেয়াল-প্রসূত এই সৃষ্টি-সমবায়ে
আরো কিছু দূরে চলো অহল্যা অবধি—
শীতল পাষাণ বাঁধো ঋতু-স্নাত মনে।

সমস্ত মৃত্যুর পথ ফেলেছি হারিয়ে,
শান্তির মোহানা রুদ্ধ তবু ও জগতে
গ্রহ আর নক্ষত্রের অভিশাপ নিয়ে
আমাকে প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে জানি-
আরেক আগুনে পুড়ে, না-মরার গ্লানি
বুকে নিয়ে, সুধারিক্ত নীলকণ্ঠ ব্রতে!

বিষে-বিষে বিসর্পিত এ-দুর্মর প্রাণ
এবার নিশ্চল করো, স্নায়ুগুলো চিরে
জন্মগত অধিকার—আশা, শান্তি—সব
নিঃশেষে মন্থন ক'রে শুক্‌নো, ম্রিয়মাণ
অস্তিত্ব বজায় রাখো এবং শরীরে
মূঢ় অনুভূতি দাও শিথিল, নীরব!

তারপর চলে যাক্‌ বহু, বহু দিন—
একে একে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির

পদধ্বনি দূর থেকে দূরতর হোক্ ;
প্রতিটি যুগের শেষে তোমার বলির
পশুদের শোধ করে দেব সব ঋণ—
তখন স্থবির আমি, আমি বীতশোক !

আমার ফসিলে শুধু তুমি রেখো এঁকে
এ-যুগের ইতিহাস ; কর্ণের রথের
চাকার গভীরতম চিহ্ন মনে রেখে
সে-আলপনা শেষ কোরো ! আমি যেন ফের
কুরুক্ষেত্র, হিমবাহ অতিক্রম করে
স্বরাট, উন্নত থাকি প্রলয়-সাগরে ॥

অব্যক্ত

এখনো অনেক রাত শহুরে গলিতে ঠাসা ! মেঝের ওপর
নিঃসাড় ঘুমিয়ে তুমি ঃ প্রচণ্ড ঝড়ের পরে প্রশান্ত সাগর
মগ্ন ঘন-নীল ঘুমে। সারা ঘর আলো কোরে
কেরোসিন বাতি
লাল চোখ নিয়ে জাগে, কালিপড়া চোখ ; আর
আমি ওরই সাথী
তুষানল জ্বেলে মনে জ্বলে মরি রাতভর—যাবার সময়
হয়নি এখনো, তবু ঘুমিয়ে থাকার মৃত-লগ্ন এটা নয়।

তোমার ওই শীর্ণ দেহ ! পশু-হিংস্র নখ, দাঁত
কত যে ধারালো !

নিশাচর ত্রারা। তুমি রক্তের জোয়ারে আনো
সকালের আলো,
বিশ্বের অভয় মন্ত্র! তারপর স'রে যাও পর্দার আড়ালে।
চক্‌চকে লোলুপ চক্ষু বাঘেদের—সারাবনে দাবানল জ্বালে;
হরিণীরা ছুটে আসে তোমারই পশ্চাতে—হবে
তুমিও হরিণী?
খাণ্ডব-দাহন যজ্ঞে আমি তো কখনো হাতে
গাণ্ডীব ধরিনি!

ঘুমাও, ঘুমাও তুমি! জাগাবোনা, জেগে রবো
আমি পাহারায়;
আমার নিশ্বাসে যেন ভয় পেয়ে কেঁপে উঠে
অব্যক্ত কান্নায়
চোখ ঢেকে লুকিয়ো না। যাবার সময় হলে যাবই! একাকী
মেরুদণ্ডে পৃথিবীটা আরেকটু ঘুরুক, বসে ততক্ষণ থাকি—
এখনো অনেক রাত! কেরোসিন-বাতি-মৃত-গন্ধ অন্ধকার:
বেসুরো হাওয়ায় ডেকে জাগাবোনা, না, তোমাকে
জাগাবোনা আর॥

মানবাত্মার আর্তনাদ

হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করে আজো টিকে আছি—
প্রকৃতির হাতে তবু নিজেকে করিনি সমর্পণ।
যুদ্ধ করে, তার পর যুদ্ধ করে, ক্ষত নিয়ে বাঁচি—
সহজাত প্রেরণায় সাবলীল রাখি উদ্বর্তন।

যোদ্ধৃদের প্রচেষ্টায় অকস্মাৎ অগ্নি আবিষ্কার
এবং বিস্ময়কর রমণী, আত্মজ; মরণের
বিশল্যকরণী, সুধা, সুরক্ষিত গুহা ও শিকার—
তবু কি এসেছে ঘুম সম্রাটের, অধিনায়কের ?

এ-শিবিরে ঘুম নেই, শান্তি নেই, আছে উত্তেজনা !
প্রকৃতি বদ্‌লায় রং ডালে-ডালে ! পাতায়-পাতায়
বর্ণচোর, সর্বজয়ী আমার সন্ধানী আনাগোনা ;
যুদ্ধ করে মৃত্যু চাই প্রেমানুগ শান্তির আশায়।

অথচ যেদিন যুদ্ধে প্রকৃতিকে বেঁধেছি—সংহিত
মৃত্যু, প্রেম, শান্তি, ঘুম—সব থেকে হয়েছি বঞ্চিত ॥

জন্মান্তর

আপন সত্তার কাছে কান পেতে শোন্—
রাম-নাম ধ্বনিত হয় এ-দেহ-বল্মীক স্তূপ থেকে !
তোর কাছে নগ্ন হয়ে আসে ত্রিভুবন ;
শোকের গভীর ক্ষত কিছু রাখ তার বুকে এঁকে !

অগণন পুরুষের রক্তাপ্লুত শব
যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ—কত দেখেছিস ! এইখানে
তোর পাশে তারা পড়ে রয়েছে, নীরব
অথচ নিমেষে সাড়া দেয় এক সঞ্জীবনী-গানে।

দয়িতার শিবালিক অশ্রুর ফোয়ারা
কী দ্যুতি বহন করে। অকস্মাৎ কী স্বচ্ছ ব্যথায়
সুপ্তোত্থিত সত্তা তোর হয় আত্মহারা !
রে বাউল, বাক্‌দত্ত রত্ন রাখ্ এই সিকতায়।

মিথুনে নিমগ্ন ক্রৌঞ্চ-দম্পতির বেশে
আসে প্রেম ; এ-পাঁজর বল্মীকের দংশনে জর্জর
এবং পৃথিবী-প্লাবী আনন্দ-আশ্লেষে,
যুগে-যুগে, কবি তোর অভিনব এই জন্মান্তর ॥

সতর্ক দৃষ্টির প্রশ্নে

সারাদিনে শীর্ণ পথে যেটুকু আকাশ চোখে পড়ে
তাই নিয়ে খুশী থাকি, বেঁচে থাকি এ-সংকীর্ণ ঘরে।
তা বলে যতই বাঁধো, এই সত্তা স্বরাট-উদাস ঃ
প্রবাসে ভ্রমণকারী রবেনা, রবেনা বারো মাস !

সারা রাতে জানালায় দুচোখের আলো নিয়ে কাঁপে
যে কটি তারার চোখ, তাদের স্বপ্নের শেষ ধাপে
চলে যাই ; পৃথিবীর নিয়মে আমাকে ধরে রাখা
কঠিন ! যদিও কাছে তবু যেন দূরে পড়ে থাকা !

সতর্ক দৃষ্টির প্রশ্নে মুখোমুখি দাঁড়ানো নিষ্ফল।
এই সব আজ্ঞাধীন দিন আর রাতের শিকল
কখন ফেলেছি খুলে ! এই ঘর উন্মাদ-আশ্রম,
ভারাক্রান্ত ; আর দেখো, ছাতে রোদ, ছায়ার সংগম।

এ-পরিমণ্ডল থেকে সরে যাও ! এখন দ্বিগুণ
ধারালো চেতনা ! যাবে ফুরিয়ে তোমার পূর্ণ তূণ
তবু আমি এই ঘরে এক মৃত সৈনিকের মত
পড়ে থেকে তোমাকেই করে যাবো অযথা বিব্রত।

নির্লিপ্ত মন

নৌকোটা নোঙর করা ; দিনান্তের শ্রান্তি ধুয়ে মুছে এতক্ষণে
নবজাতকের হাসি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুমোতেছে দুটি নরনারী।
ওদের নির্লিপ্ত মন স্বচ্ছন্দে সমুদ্র বক্ষে সাময়িক পাড়ি
জমিয়েছে। বেহিশেবি হরিণ-হরিণী খণ্ড-প্রলয়াবর্তনে
সবুজ ঘাসের মাঠ পার হয়ে সাহারায়, উটেদের দেশে
ছুটে গিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধলো আপন মন এবং তা দেখে
বসন্তে বিদায় নিলো কোকিলেরা, তুচ্ছ ক'টি অভিজ্ঞান রেখে ;
তবুও এ-দুটি মন নিশ্চিন্তে ঘুমোয় কী যে নিবিড় আশ্লেষে !

এ-নবজাতক আজো পারেনা একাকী হামা দিতে দেশান্তরে।
মাটি জুড়ে মরুভূমি, পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র এবং
আকাশে অজস্র মেঘ, ঝোড়ো হাওয়া, অন্ধকার—ওড়বারও ঢঙ
এখনো শেখেনি বলে ও-সব মনের সাথী হবে সে কী করে ?
তাই কি নির্বেদে কেঁদে শ্রান্ত শিশু পড়ে আছে স্তব্ধ,
স্বাভাবিক !
ঝরে যায় লজ্জারাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল, নিঃস্ব শিশিরের মত
নির্বিকারে, অশ্বত্থের পাতার ইশারা ক্রমে হয় অপগত ;
জানেনা, বোঝেনা তবু এরা কেউ নৌকো ছেড়ে
গেল যে নাবিক ॥

প্রফুল্লকুমার দত্ত

অষ্টম আশ্চর্য

ভেতরে আগুন জ্বলে—এই বুকে রেখে দেখো হাত ;
আরেক আগুন তুমি, পাশাপাশি স্থির ; দেহান্তরে
লেলিহান ! সূর্যকন্যা, এই পৃথিবীর দিন-রাত
যতই নিষ্প্রভ হয় আমাদেরও জ্যোতি তত ঝরে।

অগ্নিগর্ভা, তুমি-আমি স্বহস্তে অক্ষত বুক চিরে
হৃদয়ের রাম-সীতা দেখাতে সক্ষম। চরাচর
অন্ধকার কোলাহলে বিপর্যস্ত এখন। গভীরে
প্রশান্তি এলেই হবে আলোময় এই ত্থটি ঘর।

প্রার্থিত ইন্ধন এনে দুদিকেই রেখেছ প্রস্তুত
এবং তোমার স্নেহে তারা হয়ে উঠেছে ইন্দ্রাণী ;
শেষরাতে বড় শীত, পরিচিত অথচ অদ্ভুত
সুতরাং আমাকেও ঋত্বিক হতেই হবে, জানি !

অষ্টম গর্ভের ভ্রূণে যদি চাও আশ্চর্য সংঘাত—
আরো কাছে এসে জ্বালো সাতটি তারার কালো রাত ॥

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

তিনটি পাখির ছায়া

একটি ছায়া থমকে ছিলো নদীর পাশে গাছে,
একটি মাঠে ঘুরে
নিজের ছায়া দেখতে গেলো সোনালী রোদ্দুরে।

খানিক দূরে বনের ছায়ানীলে
একটি আরো নতুন ছায়া তখন দেখা দিলে!

নিঝুম শাখা কাঁপলো কেন, শাখায় কিছু পাতা
কাঁপলো কেন, মাঠের ছায়া বুঝতে পারে না তা!
যখন ফিরে আসে
নতুন ছায়া দ্বিগুণ হয়ে হাওয়ায় উড়ে ভাসে!
বদল হলো ভালোবাসার মায়া!

নিজের ছায়া দেখতে গিয়ে একটি করুণ ছায়া
এখন একা আছে!

(চিরস্থায়ী থাকে না কেউ ভালোবাসার কাছে?)

মানুষের মন

সবশেষে মনে হয়—তুর্নিরীক্ষ্য মানুষের মন
অজানা দেশের বুকে অন্ধকারে ঢাকা এক নদীর মতন!
কোনো দূর পর্বতের হিমচূড়া-সঞ্জাত তুষার

গলে গলে নেমে আসে, বয়ে চলে, আর
তীব্রগতি সে নদীর জল
পাথরে মাটিতে ঘুরে সমুদ্রের তলে মিশে ক্রমশ অতল।

অন্ধকার—চির অন্ধকার ঃ
কখনো মনের কাছে খোলে না আরেক মন
কোনো বন্ধ দ্বার!
তবু সেই অন্বেষণে চলে যায় বৃথা রাত্রি-দিন,
বিভ্রমের পথে ডাকে মন নয়, মায়াবী হরিণ!

পাশে থেকে দূরে থাকে—কী আশ্চর্য মানুষের মন ঃ
অচেনা দ্বীপের বনে অন্তরালে মেশা এক পাখির মতন!
কোনো গাছে রহস্যের আলোছায়া-চিত্রিত আড়াল
খুঁজে নিয়ে বসে আছে, হিজিবিজি ডাল
শোনে যদি সে-পাখির স্বর
তখনি বাতাসে ছুঁড়ে প্রতিধ্বনি করে তাকে বনের ভিতর!

আর সেই শব্দ শুনে দূরে-কাছে লক্ষ্য করি যেই—
সুনির্জন বনে দেখি কোনো নদী, কোনো পাখি নেই!

সেই বাড়ীটা

কোথায় যেন হারিয়ে গেছে এই শহরে
সেই বাড়ীটা,
সেই বাড়ীটা
হারিয়ে গেছে কোথায় যেন এই শহরে!

চলতে চলতে হঠাৎ কোনো পথের বাঁকে
আবার ফিরে চিনবো তাকে ?
তেমনি আছে মাটির টবে ফুলের চারা, আইভি লতা,
খাঁচায় বসে একটা পাখি বলছে কথা, নীল শাড়ীটা
মেঘের মতো ছড়িয়ে আছে, জ্বলছে রোদে একলা শুধু
সেই বাড়ীটা,
নিঝুম পথে উড়ছে ধুলো হাওয়ায় ধূ ধূ !

এখনো গোল দ্বীপের মতো হয়তো ভাসে
পুরনো নিমগাছের ছায়া—চেনা গলির পাশে ঃ
দুপুর বেলা ভালুক নিয়ে নাচাতে কেউ আসে,
অবাক সুরে বাজছে হাতে ডুগডুগিটা !

দেখতে দেখতে আবার কোনো মজার খেলা
ফিরিয়ে দেবে বালক-বেলা ?
লাটিম ঘোরে উঠোন-শানে, টিনের চাকা ঝমঝমিয়ে
একটা গাড়ী ডাকছে এসে আড়াল দিয়ে, সেই গাড়ীটা
আমায় নিয়ে হারিয়ে যাবে আবার যেন এই দুপুরে,
নীল শাড়ীটা
মায়ের কথা জানিয়ে দেবে হাওয়ায় ঘুরে !

কোথাও জানি লুকিয়ে আছে এই শহরে
সেই বাড়ীটা,
সেই বাড়ীটা
লুকিয়ে আছে কোথাও জানি এই শহরে !

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

আকাশের দৃষ্টি

আমাকে উতলা করে চিরকাল আদি অন্তহীন
আকাশের সমুদ্র-ইশারা,
কোটি সৌরজগতের নৌকোগুলি আলোক-রঙ্গিন
পাল তুলে হলো যার তরঙ্গ-গভীরে দিশাহারা !
উপকূল রেখা নেই—ও কী নীল রহস্যের খেলা ?
শূন্যতায় ঘুরে যায় কত শত নক্ষত্রের বেলা !

বেলা যায় আরেক প্রান্তরে।
মিটিমিটি দীপ জ্বলে সন্ধ্যামুখী পৃথিবীর ঘরে !
অরণ্য-রাত্রির ছায়া ঢেউ ভেঙে মিশে যায় জলে,
ফুল পাতা খসে পড়ে, নদী তার চিহ্ন নিয়ে চলে !

তবে এক জিজ্ঞাসায় মন দোলে—আমি কোথা যাবো ?
আমি কার চিহ্ন নিয়ে সময়ের আবর্তে হারাবো ?
চেনা চেনা মুখগুলি বিস্মৃতির চোরাবালি মাঝে
ডুবে যায়—চিহ্ন থাকে না যে !

একাকী আকাশ থাকে বহুদূরে চিরস্বপ্নলীন
যেন কার শাশ্বত ইশারা
মহাকাশে দেখে—গ্রহ-বিশ্বগুলি নীলাভ রঙ্গিন
জটাজালে বেঁধে নিয়ে ধ্যানের নির্জনে বাণীহারা !
এই ছোট পৃথিবীর জীবনের শ্রান্ত কোলাহলে
তুচ্ছ কত আয়ু নিয়ে আমাদের দিনরাত্রি চলে !

ও কী মহা মৌনতায় ডুবে আছে আকাশের মন ?
কালাতীত অন্ধকারে কী ছবি সে করে নিরীক্ষণ।

ছায়া-মানুষ

হয়তো, এমন হতে পারে—
গোধূলি-মাঠের বুকে রক্তাভ আলোর পরপারে
অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম !
ওই নিস্তরঙ্গ দীঘি, কলমিলতার দাম
এতটুকু জানবে না সেই
আশ্চর্য ছায়ার কথা, এখনি যে ছিলো কাছে —
এখনি যে নেই !

জীবন-পিপাসা নিয়ে ব্যর্থ তবে প্রহর গোনা কি ?
শোনো কাশবন
কী গভীর অনুরাগে পেতে চাই তোমাদের মন,
হায় রে শালুক ফুল, আকাশের নীল তারা,
সন্ধ্যার জোনাকি !

আমি তো রেখেছি মনে সকলের মধু পরিচয় ঃ
আলোকিত দৃশ্যপটে আঁকা
সেই ছবি চিরস্থায়ী নয় ?
পিছনে আরেক পট আছে কালো অন্ধকারে ঢাকা ?

পৃথিবীর যাদুঘরে—চিরন্তন কালের খেয়ালী
কোনো যাদুকর
পুরনো কথায় তবু বেঁধে রাখে নতুনের স্বর,
বিগত ফলের বীজ, জীবনের রূপরেখা,
মৃত্যুর হেঁয়ালি !

তাহলে কখনো ফিরে রহস্য-আলোর এই পারে
দৃশ্যপটে আবারো এলাম—
হয়তো, এমন হতে পারে !

নিঃসঙ্গ যাত্রা

সব চলে যাবে, ওই লাল ফুল-নন্দিত ভ্রমর-
বসন্ত-যৌবন-ঋতু-দিন-মাস-স্বরশঙ্খ পাখি,
হলুদ পাতার ছবি আর শান্ত সন্ধ্যার জোনাকি
কালস্রোতে চলে যাবে তরঙ্গের মতো, পর পর !

কত গেলো, অন্ধকারে মিশে গেলো কারুকার্য সব-
ধর্মচক্র-শিলালিপি-শিলামূর্তি-অজন্তা-ইলোরা-
বিজিত সাম্রাজ্য আর ঘাতকের কলঙ্কিত ছোরা ;
নিঃশব্দে ঘুমালো একা পিরামিডে মহামান্য শব !

সব চলে যাবে, ওই নক্ষত্র-শোলার নীল ফুল,
চালচিত্র আকাশের নীচে যত সৃষ্টির প্রতিমা
কালের নদীতে যাবে পার হয়ে দৃশ্যপট-সীমা,
নেপথ্যের পরিণামে বাঁধা যত নশ্বর পুতুল
জীবনের মঞ্চে এসে চিরস্থায়ী কখনো হবে না !
সব চলে যাবে, স্থির বিন্দু হয়ে কিছুই রবে না !

গৌতম ধারাতে—একটি বিকাল

এখানে আকাশে-পাহাড়ে-মাটিতে অন্তরঙ্গ—
যেন তিনজন পুরনো বন্ধু নিরবধি কাল
মুখোমুখি বসে অনুভব করে মধুর সঙ্গ !

সুন্দরী এক কিশোরীর মতো কুমারী বিকাল
ঝর্ণা-জলেতে গা' ধুয়ে যখন ঘরে ফিরে যায়
দুটি চেনা ফল বুকে নিয়ে কাঁপে হৃদয়ের ডাল !

নীলাভ শাড়ীতে ঢাকা পড়ে তাই সোনালী অঙ্গ—
আঁচলে তিনটি তারাফুল দোলে সান্ধ্য হাওয়ায় !

দীনেশ মুখোপাধ্যায়

(১৯৩২)

নির্ভর অন্বয়

অন্ধকারে নিয়ে চলো, সময়ের এই উত্তরণে
হে আমার প্রিয়তম ইন্দ্রিয়-সুহৃদ, অস্তিত্বের
অন্বয়ে নির্ভর এক দৃশ্য আনো অনন্য ঘ্রাণের ;
তৃষ্ণার ভৃঙ্গার ভরো তমিস্রার উষ্ণ প্রস্রবণে।

এ-ছাড়া সান্ত্বনা নেই ! কামনার এমন বিহার
ব্যর্থ হলে, অসংশয়ে বিক্ষুব্ধ সে লালিত শার্দূল
অসমর্থ মহিমায় প্রাণ-বৃন্তে ঝরাবে মুকুল !
অন্তরে শোহিনী কাঁদে অনুভবে আরেক ইচ্ছার !

গভীর, গভীরতর অরণ্যের নর্ম অভিসারে
ছ্যাখো চেয়ে যূথচারী অনিদ্রার মগ্ন ইতিহাস
দানব, ঈশ্বর, নর রমণীয় লোভের বিভাস
নিসর্গের ধারাপাতে লিখে গ্যাছে ললিত শীৎকারে !

আকাঙ্ক্ষার অহঙ্কারে জীবনের বিচিত্র অয়ন—
অভিজ্ঞ সঞ্চয়ে দুঃখ পাণ্ডুলিপি সাজায় উৎসবে,
স্বরাজ্যে সম্রাট শোনো, ক্লান্তি যদি আকীর্ণ বৈভবে
মথিত সত্তার নীচে সুরু হোক স্মৃতির তর্পণ।

অন্তরে শোহিনী কাঁদে অনিদ্রার এই উজ্জীবনে
তৃষ্ণার ভৃঙ্গার ভরো তমিস্রার উষ্ণ প্রস্রবণে ॥

দায়ভাগ

না, আমি পারিনা ছেড়ে যেতে কিছুতেই সময়ের
করগত দিন-রাত্রি, দুপাশের বহমান স্রোতে
আবহমানের জমা মৃত্তিকার গভীর ক্ষতের
উত্তরসাধক-ব্রত ফেলে কোন নিজস্ব জগতে—

যেখানে একক আমি : প্রতিদৃশ্যে কল্পিত নায়ক
সজ্জিত মঞ্চের পরে ঋজুদেহ, প্রত্যয়-কঠিন
ইঙ্গিতে প্রাসাদ গড়ি ঐশ্বর্যের শত ইন্দ্রলোক
নিষ্ফল মুহূর্তগুলো অনির্বেদ আলোয় রঙিন।

তবু সে-আশ্রয় ছেড়ে নেমে আসি প্রত্যহের ভীড়ে।
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে লবণার্দ্র, ইতস্তত সতর্ক সন্ধানী
কণ্টকিত গোলাপের লোভে যাই বিক্ষত শরীরে
নখাগ্রে সঞ্চয় করি নিষণ্ণ বাসনা, ক্লেদ, গ্লানি।

রোদ্দুরে, বিদ্যুতে, বজ্রে, ঝড়ে, জলে দিগন্ত অবধি
প্রকীর্ণ, দুর্বারে কাঁপে প্রবাহের মন্দ্রিত তেহাই
দুঃখের পাহাড় ফুঁড়ে জেগে উঠি যন্ত্রণার নদী
উত্তরপুরুষ-দ্যুতি রক্তে লাগে, জ্বলে রোশনাই!

নির্জনে সাজানো ঘর পড়ে থাকে অন্ধকার কোণে
পতঙ্গের মত চলি জনারণ্যে আপন-দহনে॥

দীনেশ মুখোপাধ্যায়

দৃশ্যান্তর

দরজায় করুণ শব্দ :   মরচে-পড়া কব্জাগুলো কাঁদে
জানলার পর্দায় সূর্য ম্রিয়মাণ মূঢ় অবসাদে
অব্যক্ত ব্যথার চোখে অপলক অপেক্ষার কোণ
স্পর্দ্ধিত বিষাদ ঘুরছে দৃঢ় দর্পে চৌদিকে এখন।

পুষ্পিত বাগান শূন্য :   শুকনো কটি পাতা নড়ছে ধীরে,
অধরে নিগূঢ় উক্তি ব্যস্ত হাওয়া আপন গভীরে।
সে থাকতো এ-ছোট্ট ঘরে, সুচিস্মিত, পেলব দুহাতে
শান্তির প্রসন্ন বৃষ্টি—শুশ্রূষার ; নিদ্রাহীন রাতে
ভাবতো বসে ইচ্ছাধীন নক্ষত্রের অনিবার্য ক্ষয়ে
উত্তেজিত অনুষঙ্গ মূর্ত কোন উজ্জ্বল বিস্ময়ে।

দৃশ্যান্তরে পটভূমি !   এ-নায়ক নির্বোধ সন্তাপে
স্নাতক সন্ধ্যার দীপ স্তূপীকৃত শূন্যতায় কাঁপে ;
সহিষ্ণু রক্তের নীচে বিস্মৃতির দুরন্ত প্রয়াস
পরাস্ত ; স্মৃতির তীর্থে প্রকৃতির দৃপ্ত পরিহাস।

দূরাবর্ত

আবর্তে অবোধ ইচ্ছা, রক্তে যার রোদ্দুরের গান
আসঙ্গে বিপন্ন কোন দূরায়ত ভোরের কল্লোলে
সন্তাপে, আসন্ন শোকে মনোনীত মৃত্তিকার ঘ্রাণ
কিশোরী লগ্নের বৃন্তে যন্ত্রণার পদ্ম নিয়ে দোলে।

কখন তৃষ্ণার জলে ক্লান্ত দেহে রিক্ত বারবার
একান্ত গাহনে তবু তৃপ্তিহীন, আর্তির কঙ্কাল
নিদ্রার রক্তাক্ত শিরা ছিন্ন করে অদৃশ্যে ফেরার
অক্ষম স্রোতের বৃত্তে বিবর্তিত সায়াহ্নের কাল।

অথচ নির্ভর লোভে আত্মগত মার্জারের মত
চৌকাঠে প্রতীক্ষা ঢের সাশ্রয়; এবং রাত্রিদিন
নারী, অন্ন-সংস্থানের বাহাদুরি গল্পে ঢেকে ক্ষত
শ্রদ্ধেয় আলস্য নিয়ে বাঁচা নয় তেমন কঠিন।

কিন্তু সে-নির্বোধ স্নায়ু নব্যন্যায়ে নাবিকী ভঙ্গীতে
আঁধার সমুদ্রে ভাসে সন্দিহান আলোর সঙ্গীতে॥

ফেরারী

আসেনা দুরন্ত ঝড়, ধূলি-রুক্ষ হাওয়ার চীৎকার,
বিচূর্ণ করেনা শিলা, বনস্পতি, নির্জিত প্রাসাদ
বরং বিষণ্ণ দিন নম্রপায়ে দীর্ঘ সীমানার
বিস্মিত আঁধারে রাখে প্রাত্যহিক ক্লান্তি, অবসাদ।

সে-দুঃখ দেয়না তীব্র আকাঙ্ক্ষার নির্দয় আঘাত,
সহজ সরল লাস্যে প্রস্তরিত সত্তার শোণিমা;
ক্ষয়িষ্ণু আলোর নীচে কেঁপে উঠে কখন হঠাৎ
অলক্ষ্যে নীরব হয় অনিকাম স্থবির দ্রাঘিমা।

দীনেশ মুখোপাধ্যায়

প্রখর রৌদ্রের দাহ পলাতক লগ্নের সঙ্গমে
জানালা কপাট বন্ধ : প্রতিবাদ স্পষ্টত অলীক,
যথেচ্ছ বিহারে লোভ পুঞ্জীভূত জীবন-জঙ্গমে
অক্ষম ; নারীর তৃষ্ণা অনীহার দ্বিতীয় প্রতীক !

ফেরারী তুরন্ত ঝড়, প্রত্যয়ের তীক্ষ্ণ অঙ্গীকার—
বিচূর্ণ করেনা শিলা, বনস্পতি, প্রাসাদ, শোণিমা,
জানালা, কপাট বন্ধ : প্রতিবাদ স্পষ্ট নির্বিকার ;
পায়ে-পায়ে অকীর্তিত স্থান, কাল, প্রতীতি, মহিমা

রমেন্দ্র মল্লিক

(১৯৩২)

আকাশ-পিপাসা

আকাশ-পিপাসা নিয়ে কামনার পাখা মেলে মন উড়ে যায়
মাটির গন্ধেই রেখে ঘুঘুর বিষাদ সুরে বেদনা বীণায়,
কোলাহল উর্ধ্বে গিয়ে অরণ্য পাখির ডাকে সুর ফিরে আসে
সুদূর মেঘের কোণে একটি স্বরের রেশে বাঁধাসুর ভাসে
গভীর আবেগে প্রাণে ; রঙ্ছুট বিকেলের সূর্যের আকাশ
কৃষ্ণকালি লাল নিয়ে চোখে চোখে এক ঝাঁক হৃদয় আভাস
বুঝি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় ; দক্ষিণী বাতাসে আসে অরণ্যের ঘ্রাণ,
মনে হবে মিশে আছে মিহি বৃষ্টি মিষ্টি স্বাদে সেখানের প্রাণ।

এলো মেলো ঝড় এলো মনের অরণ্যে কত দেবদারু ঝাড়ে
আকাঙ্ক্ষা অসহ্য ভিড়ে, একটি পাখির স্বরে যেন বারে বার
গানের ঝরনাধ্বনি বেদনা পাহাড় ঝরে চঞ্চল আশায় ;
নরম স্বপ্নের রোদে রূপালী জলের ছিটে কামনা জাগায়।

তখন পাখীর মন আকাশ-পিপাসা নিয়ে খোঁজে দুটি চোখ
আচ্ছন্ন সময় নিয়ে হয়তো যেখানে রাত্রি তারার আলোক।

মনের ফসলে

কার্জন পার্কের ধারে কৃষ্ণচূড়া ডাল ছুঁয়ে গোলাপী গোধূলি
সূর্যের সোনালী রোদে বিকেলের শেষ করে সেদিনের ঝুলি,
আলোর উৎসব শেষে তখন পাখিরা আনে পাখার ঝাপটে
সোনালী সন্ধ্যায় স্বপ্ন একটি বা দুটি শুধু সংশয় সংকটে।

ভাটিয়ালী মনে সুর আউট্রাম ঘাটে বুঝি জল ছুঁই ছুঁই,
প্রলোভন পদক্ষেপে ফাঁদে পাতা সেখানের শরীর শুধুই
ঝুঁকে থাকে আর এক শরীরি আত্মার দিকে চেতনা গভীরে
জীবনের আকাঙ্ক্ষিত মায়াবী রূপের রেখা সৃজনী নিবিড়ে।

আমাদের মন আছে মাছের শরীর নিয়ে পিচ্ছিল চঞ্চল,—
ধরা পড়ে ফাঁদপাতা দৃষ্টির লোলুপ জালে তবু অনর্গল ;
পাখির ডানার ঘ্রাণ অনুভূতি গভীরেই খুঁজে পায় শ্বাসে
কার্তিকের হিমে ভিজে অন্ধকার সবুজে মাঠের বুঝি ঘাসে।

তখন যে মনে হয় আলোর সাগর ফেলে কালো দ্বীপে থাকি
বাতাসের ঢেউ নিয়ে নরম হৃদয় ছুঁয়ে কত মন রাখি,
কত স্বপ্ন রাখি শুধু সত্য ক'রে জীবনের কামনা অতলে
প্রাণের গভীরে যেই স্পর্শ রাখে মিশে গিয়ে মনের ফসলে।

ঊনত্রিংশের চেতনা

শরীরে আমার কিসের চেতনা
বুকের হাপরে আগুন রাঙানো,
তোমার কাছেই মন কি যেতো না
দূরে থেকে শুধু আশায় তাকানো

পেচক দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ
হৃদয়ের ঘুম যখন জাগানো
তোমার মনের চরে আরব্ধ
দূরে থেকে শুধু আশায় তাকানো

কামনার বীজ মনেই ছড়িয়ে
চিন্তিত চোখে বোবার বেদনা,
তোমাকে আকুতি আশায় ভরিয়ে
শরীরে আমার কিসের চেতনা।

শরীরের প্রতি লোমের নিবিড়
জেগে ওঠে শুধু হৃদয় ভাবনা,
উনত্রিংশের পূর্ব শরীরে
একটি কুসুম চয়নী যাতনা।

পাণ্ডুলিপি

জীবন তুর্বোধ্য এক পাণ্ডুলিপি, পাতায় পাতায়
শুধু অস্পষ্টতা তার
কালের কান্নার জলে ভিজে গিয়ে মেঘলা আকাশ
বুঝি যেন একাকার,
কথাগুলো ছায়া হ'য়ে চোখে ভাসে পুরনো পাতার
ভাঁজে অচেনা অক্ষরে
অজানা ভাষার ধ্বনি কান পেতে কখনো যাবে না বোঝা
ফেনিল সাগরে।

মনের ইজেলে এসে ধরা দেবে আদিম তৃষ্ণার ছবি
কল্পনার রঙে
অনুভূতি জীবনের এঁকে যাবে কথাহীন তুলির আঁচড়ে
আর রঙে
শরৎ আকাশে ভাসা ফালি মেঘে অজানা শিল্পীর হাত
যেন মনে পড়ে

রমেন্দ্র মল্লিক

মনে পড়ে ছুঁয়ে গেছে জীবনের যদি কিছু জল ছবি
ছাপটুকু ধরে।

এ-জীবন পাণ্ডুলিপি তবু ভাবি আশ্চর্যের আরো আছে
কত না ভাষায়
গোড়া থেকে শেষ দিকে যত যাই মনে হয় অস্পষ্টতা
পাতায় পাতায়;
অর্থটুকু পাঠ করা চেতনার গভীর সত্তার বুঝি
প্রিজম আলোকে
সম্ভাবনা নেই বলে সান্ত্বনার স্থর ভাসে অন্য কোথা
অন্য কোন লোকে।

শরীরের শিরে শিরে সচঞ্চল কত রক্ত কণিকায়
আয়ুর চেতনা
আমাদের জীবনের বেঁধে রাখে নীল উপশিরা যত
হৃদয় বেদনা,
একটি গভীর কোন অনুভূতি অর্থহীন ছায়াটুকু
তবু ফেলে যায়
একটি প্রেমের চোখে চেয়ে থাকি প্রতিদিনে তবুও তো
পাতায় পাতায়।

নিখিলকুমার নন্দী

(১৯৩৩)

অবিস্মরণ

উপেক্ষা করেছি আমি ? মিছে অনুযোগ, সখি, মিছে,
বন্ধুতার অভিমানে থাকতে চেয়েছি শুধু নিচে।
স্বাভাবিক স্বাধিকারে অনিচ্ছুক অপ্রমত্ত কেন
ভুলে যেতে চাই আজ। নীল তারা অন্ধকারে যেন
চিরকাল জ্বলে যায়, সূর্যালোকে তার মৃত্যু কাঁপা
অর্থহীন। অনাদ্যন্ত আকর্ষণ কথা দিয়ে মাপা
কখনো কি যায় ? তাই তাকে আর এনো না বাহিরে
ত্ব'হাতে হৃদয় চেপে যে চলেছে ভিতরের তীরে।
মূল্যবোধে স্থিত মন অনায়াসে নির্মম কঠিন
প্রতিভাত তথ্যগুলি সত্য নয়, উপলব্ধিহীন
নয় সে বলেই তার বঞ্চনাবিলাসে অভিরুচি
যতক্ষণ ছিল সে যে তিলে তিলে হয়েছে অশুচি।
তুচ্ছতম অদর্শনে বুঝেছে : ভোলার তলে তলে
অশ্রুজলের খেলা ছিল তাই যাই নি বিফলে॥

পাপবিদ্ধ

বলেছে সে : মৃত্যু চাই, মরে যেতে এত ইচ্ছে করে.
অথচ সে জানে এই ইচ্ছে তার বাঞ্ছনীয় নয়
যদিও অনেককাল ভুগেছে কঠিন এই জীবনের জ্বরে
আজ এতদিনে তার মৃত্যুসাধ নিশ্চিত বিস্ময়।

কিন্তু এই জীবনে কি বিস্ময়ের কোন মূল্য আছে
যখন মুহূর্তগুলি নিরন্তর অনিশ্চয়ে কাঁপে
যেখানে মমতা প্রেম বন্ধুতাও আসে এক নির্বোধের কাছে
আবেগের শকুন্তলা বিচ্ছেদের মৃত্যু মানে মহাজ্ঞানী
আর্য অভিশাপে।

তাই আমি বলি : ছাখো ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর আস্বাদ
পাই না কি যতবার ভাবি আমি জয়ী, আমি প্রীত।
যখনই জেনেছি, হায়, হৃদয়ের খেলা নিয়ে করেছি যে
কত অপরাধ
তখনই ভীরুর প্রাণে, পরাজয়ে বুঝি নি কি মূঢ় আমি,
ম্লান আর মৃত।

•

আজন্ম মৃত্যুর পথে এতবার বিনাশী স্মারক
যে ছুঁয়েছে তার কাছে মৃত্যুসাধ আত্মপ্রতারক।

তার চেয়ে এসো মাতি রৌদ্র আর জ্যোৎস্নার মেলায়
মৃত্যুর বিলাসী হয়ে অপযশ স্বপ্নচারিতার
না কুড়ায়ে। সর্বনাশা মিলন-বিচ্ছেদ মানি।
সহজ এ প্রাণের খেলায়
দুঃখেরে ডরে না কেহ দুঃখে তবু হাসিছে সংসার।

অমৃতসন্ধান

তোর ওই চক্ষুদীপিকায়
বিদ্যাপতি মেঘদূত সব বুঝা যায়।
দেবেন্দ্রনাথ সেন

"...that was her eyes. In them was seen a sublimation of all of her ; it was notne cessary to look further : there she lived."
Thomas Hardy

নিয়ত নিজের মৃত্যু ভুলে যেতে অন্য কত মৃত্যুচিন্তায় আমি
মগ্ন আছি :
তাই বারবার চাই ওই চোখে, মৃত্যুবিষে, মদিরাক্ষী,
তারপর অলৌকিক বাঁচি।
তোমার সমস্ত সত্তা বনহরিণীর মত আছে লীলায়িত হয়ে
ওইখানে :
কবির প্রত্যয় আর প্রেমিকের প্রতিশ্রুতি উন্মুখর-উন্মনা
কোন্ গানে।

আহা সেই গান কেন রাত্রিদিন শুনি।
আর গুণে যাই মৃত্যুর প্রহর
সমুদ্রের থেকে দূরে চলে এসে শুনি তবু সমুদ্রের স্বর।
অথচ সমুদ্রস্বাদ যাতে চাই গহনগূঢ়তা সমুদ্রের নেই তাতে
গভীরসন্ধানী কোন সূক্ষ্মমৃদু-আলোহীন আদৌ সে সমতল
অন্ধপ্রায় রাতে।

নয়নসর্বস্ব সে। মন তার আছে কিম্বা নেই।
হৃদয়ের উথালপাথাল
সেখানকার নয়। কোন বক্রতা, ঢেউয়ের ভাঙা,
উদ্বেলতা-সহচর কোন্ ছন্দ-তাল
বাজে না বাজে না। শুধু নীল চোখ আছে আর বিষ তাতে
জ্বলে অনির্বাণ :
রৈখিক অঞ্জনে কৃষ্ণ নিয়তি নিয়ত টানে অনুরাগী চিত্ত মেঘম্লান।

তবু যাই। ফিরে আসি। ফের যাই বস্তুত কোন্ অশ্রুনদীর
সুদূর-পারে
জ্বলেপুড়ে খাঁ খাঁ রোদে। ভাবি মনে গেছিলাম দুর্লক্ষ্য
নীলিমা-পারাবারে।

দিনগত

যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাবো তাই জীবনগানে।

একথা ভেবেই যৌবন হল উতল বাউল
কূলের কান্না দু'হাতে সরিয়ে ধরল অকূল।

মনে পড়ে সেই কুয়াশাকরুণ ভোরবেলাকার
জমানো পাড়ি
নদীতে নদীতে। হায় সেখানেও প্রতিকূলতার
হাওয়া একাকার ভাঙল হাল, ব্যর্থ দাঁড়ী।

সেই নদী যেই দারুণ দুপুরে সাগরে মিশলো আশ্রয়বাঁক
হারালো। ধূসর ঘনগর্জন সফেন স্বরের সর্পিল ডাক
শঙ্খমন্দ্র। দিগন্ত ছুঁয়ে সংশয় হয় প্রত্যয়বান :
বাঙ্কবতীররেখা কি ?
মানে না হৃদয় : বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।
সমুদ্রময় যুদ্ধজীবনে শান্তি-এষণা রুদ্ধঅশ্রু
অলীকস্পর্শী। ঘন-কালো মেঘে কাজলের টানা
বজ্রের দূত তড়িৎবাহিনী।
পুষ্পবিলাসী বসন্ত তাই হয়েছে গল্প এবং নীলিমা
ময়ূরকণ্ঠী তুচ্ছ কাহিনী।
মেঘফেননিভ শয়ন হয়েছে পঙ্কশয্যা।
রক্তের নীড়ে লালিত আবেগ মোহের লজ্জা।
কুহুস্বর শুনে চম্‌কে ভাব্‌ছি : হায় দুর্মর কেকা কি ?
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।

দিনান্ত

তারপর ? সব আজ খালি। দিলাম ফিরায়ে সব।
সময়ের স্রোত বয়ে যায় :
হৃদয়ের মোহাবেগ ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো সামাজিক
কাজে ও কথায়।
তবু ভালো স্রোত আজো আছে। তবু ভালো
ঢেউয়েরা পাগল।
ভেসে যায় শৈবালের দ্বীপপুঞ্জ ঃ করুণ জল্পনা আর
ক্লিষ্ট মনন অবিরল।

হেসে হানি প্রস্তাবিত দ্বেষের কুহক : কেন তুমি
নেমে আসবে না ওই অনর্থক অভ্যাসের সিঁড়ি ছেড়ে
প্রাণের জগতে
বাঁচবার বাঁচাবার দুরাশায় ক্ষীণমুঠি উদ্যত যেখানে কোনমতে।
মৌচাকে ঢিল ছুঁড়ে আঁকড়ে কামড়ে পড়ে থাকবে
অহংকারী আশ্রয়ভূমি!

তারপর? পাক খাই সময়ের নিক্ষিপ্ত নিরুপায়ে
মক্ষিকাও কৌতুকী ঢের, বিষদংশে ধরেছে জড়ায়ে।
অমৃতের যন্ত্রণা বড়ো, প্রাপ্যতা কঠোর সংশয়ী
বুঝেছি, যুঝি নি তাই। বঞ্চনায় ব্যতিব্যস্ত নিয়ত কুণ্ঠিত
হয়ে রই।

কেঁদে মানি ভালোবাসা ভালোবাসাহীনতার বালুচর ধূ ধূ
নদীর ঢেউয়ের বাহু না থাক রয়েছে স্রোত সময়ের খাঁ খাঁ
তাতে আছে কৌতূহলী আসা-যাওয়া, প্রতিহত প্রশ্নেরা শুধু।
পদচিহ্ন মুছে যাক অন্ধকার সময়ের কূলে। আর
পা হোক পাখা।

অবীর

স্বভাবের এই দ্বিধা সময়ের এই স্রোত অতিক্রম করি
এমন ক্ষমতা নেই। হয়তো সাহসও নেই। তাই
বিকেলের নীল আলো পার হয়ে রাত্রির তিমিরে
ডুবে যাই
ইন্দ্রধনু প্রেম ছুঁয়ে বিবেকের প্রলয়কে ধরি।

আকাশের ইন্দ্রধনু নম্র কিন্তু ভালোবাসা ঠিক নম্র নয়
বন্ধুর পৃথিবী পায়ে তবু এর ইচ্ছা ঊর্ধ্বগামী
বাসনার উষ্ণলোকে হাতের ইসারা ক্রমে কামী
দুর্বার দুরন্ত দস্যু হয়ে ওঠে। প্রাকৃত প্রলয়

প্রবল বিধ্বংসী জানি, তবু আপনাকে সে বাঁচায়
রূপান্তরে। কিন্তু এই বিবেকের বিক্ষুব্ধ প্রচণ্ড আচরণ
যত না অপরঘাতী তার চেয়ে আত্মনাশিতায়
গুরুগুরু মত্ততর। তাৎক্ষণিক এবং আমরণ।

তাই আজ এই রাতে রক্তাক্ত হৃদয় তার সামাজিক চূড়া
শ্বেতপ্রস্তরের শান্ত হিমকান্ত স্পর্শ করে জ্বলে :
ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বের সব প্রেম সব পাপ নাও তুমি
হে গোলাপ, সব লাল কৃষ্ণচূড়া, সুরা,
তারপর ছুঁড়ে দাও সর্বগ্রাসী মহাশ্বেত শূন্যতায়,
প্রবুদ্ধ বিবেকবান একেশ্বর সূর্যের কবলে।

শিবনীল

'...Its poison, my poison, lit me with its
knowing.'—Valery.

মৃত্যু কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা
যাতনা শুধুই যাতনা সুচিরসাথী।—সুধীন্দ্রনাথ

এ তোমার রাজগৃহ নালন্দা নয়
ইতিহাসের চূর্ণ ধুলোয় বিকীর্ণ,

নিখিলকুমার নন্দী

যেখানে তুমি, সুব্রত, অতীতের সৌন্দর্যের কারুকাজে
আজ বিমুগ্ধ ;
আর আমি নির্বান্ধব তৃণশয্যালীন
ঐতিহ্যবিহীন এই গণ্ডগ্রামে, মেদিনীপুর-গিধনিতে, বাংলায়।

দিগন্তবিস্তৃত স্বপ্ন আছে বটে সমতল সবুজ ক্ষেতের
শালমহুয়ার বনে আকাশের ওপারে আকাশে
বনতুলসিমঞ্জরীর লেবুগন্ধে
সকাল থেকে দুপুর বিকেল মেঘভাঙা রোদ্দুরে
ঝিঁঝিঁজোনাকের ঢের সনাতন স্বাক্ষর থেকে দূর দুরন্ত আঁধারে ;
অথচ সংসারতরণী সঙ্গে এখানেও, সর্বত্র সমান তাই।
মানুষের চিবুকের জ্যা আর মানুষীর ভ্রূযুগের ধনু
সশস্ত্র পাহারা।
ভয়লাগা রাত্তিরে জ্যোৎস্নার বুকে কপাট আছড়িয়ে
অন্ধকার যুগল-শয্যায় আমরা এখানেও নিয়মতান্ত্রিক
স্নায়ুশিরা রাত্রিজাগর।

কখনো বা সংসারের ক্লান্তি দিয়ে চৈতন্যসাগরে শান্তি খুঁজি
শাশ্বতীকে জেনে তবু ক্ষণবাদী :
অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়
নিমেষে তামাদি আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, তথা
তাতে যার জের, সে-সংসারও।

হানা দেয় ডলুংয়ের বাঁক
বনে বনে মাঠে মাঠে হাওয়াদের হাঁক
সাঁওতালি বাঁশি ক্ষ্যাপা মাদলে মাতাল
কোজাগরী পূর্ণিমার ভরাকোটাল রাত যায় সমুদ্রেই যায়।

নদীর স্বভাবী হতে চেয়েও সরসী হয়ে বাঁচো
নিষ্ফল চিরতা খুঁজি তোমার ক্ষণিক উন্মাদনে
ইডেন উদ্যান হতে ভ্রষ্ট আমি সংসারসীমার কাছে যাই,
শেষ হোক মুগ্ধতার অমা।

তন্ময়তা চাই
বিহার চৈত্যের আলো নিরালোক বাংলা সবাই
শত্রুর সম্ভাষণে খড়্গ হও
ভীষণ মহিষ এই অন্ধকার দীর্ণ করো।

সংসার নিয়তসঙ্গী
কেউ সুখী অসুখী বা কেউ
শরীর তুলেছে ঢেউ কারো, কেউ ভেঙে গেল নিঃশব্দ দেহমন।
জীবনের লাবণ্যের ততটুকু হাসি প্রয়োজন
ততটুকু আলো
রেখার মমতা যার রাজগৃহী ঐশ্বর্য আর গিধনির দারিদ্র্য
বেঁধেছে অখণ্ড জনতায়।
মাঝে আমি চিরন্তন পথিক একাই।

পদলগ্ন প্রেমার্দ্র বঙ্গীয় মাটি,
শিবনীল আকাশ রঙ্গিনী,
ডলুং জলাঙ্গী গঙ্গা মানসসঙ্গিনী।

স্বদেশরঞ্জন দত্ত
(১৯৩৩)

শিল্পী

দক্ষিণ সমুদ্র থেকে মৌসুমির ডেকে আনা ঘন
কালো মেঘের বন্যায়
চোখে তার কাজলের রেখা আঁকা যায়।
চোখে চোখে নানা রঙ
খেলার প্লাবন।

ইথারের এ-ঢেউ কে গোনে ;
মৌন তুলি এলোমেলো নক্ষত্রের দীর্ঘ শাড়ী বোনে।
মনে মনে ভাবে তাকে কোন রঙে আঁকা যায়
চোখে তার রাখা যায়
কোথায় কী রঙ
বৈশাখের শ্রাবণের কিংবা নীলা আশ্বিনের আকাশ বরং।

একটি প্রাণের তুলি দিয়ে
অস্থির রাত্রির ভীরু সমুদ্রকে নিয়ে
আশ্চর্য করুণ চোখ যদি আঁকা যায়
কী তবে দাঁড়ায়!

কিংবা ভীত হরিণীর সচেতন চোখ
এক-আকাশ ঊষার আলোক
একটি চোখের কোলে হতো আলপনা ;
আঙুলে মৌনতা, তুলি আর মনে বিভোর জল্পনা।

হলো না, হলো না আঁকা সে চোখের কথা, কি, যন্ত্রণা,
মিছেই ফুরিয়ে গেল একরাত কাল্পনিক ঝড়ের মন্ত্রণা।
ভেবেছিল এ জীবনে একটি মনের মতো শুধু
চোখ এঁকে রেখে যাবে
রঙের নেশায় মগ্ন মন তার জানতো না এত রঙ
কোথায় সে পাবে

ছায়াছবি

খেজুরের বন পাতার ছাউনি মাটির দেয়াল
কেন ছাড়লাম, কী হলো খেয়াল ?
ঘুমন্ত নদী পাশফেরা বন চারকোনা মাঠ
পরিপাটী পথ ছায়াঢাকা ঘাট
সারারাত হাওয়া খোলা সারারাত ঘরের কপাট
—কেন ছাড়লাম ?

ভাটিয়ালী সুর ভরা জ্যোৎস্নায়
মাঝিদের নাও গাঙপার যায়,
—কেন ছাড়লাম ?
মন্দ ছিল ?

ভোরে উঠে দেখা শিশু-সূর্যের এক লাফে
পার হওয়া চৌকাঠ।
ক্রমে বেলাবাড়া, খোঁড়া কাঠুরের জড়ো করা কাঠ।
এখানে সেখানে কেঁচো তুলে জড়ো করেছে মাটি।
ধোপাদের বউ আদাড়-বাদাড় কুড়িয়ে বাঁধছে পাতার আঁটি

গামছার ফাঁদে জেলের ছেলেরা ধরছে মাছ।
কুমোর পাড়ায় রৌদ্রে শুকোয় মাটির ছাঁচ।
নদীর কিনারে বেলা দুপহরে গলিয়ে পিচ্
নৌকো উল্টে মাঝিরা মাখায় উপরনীচ।
হেলা বাঁশঝাড় আড়ালে বিছোনো বালুর চর।
দাওয়ায় ছেলেটা এক মনে বসে কড়া চেটে খায় দুধের সর।
বিকেলে বিকেলে কালো মেয়েটির জল নিতে আসা,
শূন্য কলসী, খোলা জানালায় তাকানো চোখের
নির্বাক ভাষা।
কেন হারালাম এত ছায়াছবি সুপুরির বন জামতলা গ্রাম।
আর তো পারি না তখন বুঝি নি কেন ছাড়লাম?
মন্দ ছিল?

মনে মনে

অতো কাছে নিয়ো না শরীর
হাওয়ারা উতল আর কামনারা হয়নি অস্থির
এখনো সময় আছে, ফিরে এসো উতলা নির্জনে
তাকে তুমি ভালোবাসো ঘরে এসে একা মনে মনে।

মুখে তুমি নিয়ো না ও-মুখ,
ও-মুখে যৌবনজ্বালা শরাহত হরিণী-অসুখ।
তার চেয়ে ভালোবাসো তাকে
ভালোবাসো সেই যন্ত্রণাকে
যে অন্ধ বাজায় ফাটা হাড়ির পিছনে
বটের ছায়ায় নির্জনে;

মূকের বেদনা কাঁদে দশটি আঙুলে,
কখনো যেও না তাকে ভুলে।

ওর দুঃখ দূর হোক্ ভগবান মনে মনে বলো,
তাকে ভেবে চিরকাল নক্ষত্রের মতো তুমি জ্বলো।

একা-একা

আমি একা রাত্রির মত মৌন নিঃসহ হৃদয়।
কি দিয়েছি, কী চেয়েছি কবে কার কাছে
আজ তার কিছু আছে, কোন দাম আছে ?
অতীতের মৌন গুহা খুঁড়ে কিছু পাওয়া যাবে ?
নিছক সময়
ক্ষইয়ে দেওয়াই হবে সার।
তার চেয়ে এই ভাল।
বেশ আছি ক্লান্ত নদী। সুনির্জন রাত্রি। অন্ধকার।

অন্ধ তামস

চেয়ো না, চেয়ো না মন তাকে
যে ফেরাবে প্রত্যহ তোমাকে
শুধু ব্যর্থতায় ভরে।
দীপ জ্বালা কিসের আশায়
যদি না সরায় তম উজ্জ্বল শিখায়
যে-বীণার তার গেছে ছিঁড়ে
তাকে ঘিরে
কেন আর সময় ফুরানো।

তার চেয়ে মৌনমন একমুঠো নির্জনতা আনো
গভীর চেতনা থেকে। তারপর ইথারে ছড়াও,
যদি সেই বীতস্বর ফের খুঁজে পাও।
ঘুড়ি তার উড়ে গেছে হাওয়ায় উল্লাসে
ক্লান্ত সূতো শূন্যে উড়ে ভাসে,
জড়িয়েছে আঙুলে দু হাতে,
তবু যেন সব সূতো পারে না গোছাতে।

এলোমেলো ছেঁড়া তার, ভাঙা-ভাঙা স্বর।
নির্জনতা পরিপূর্ণ ঘর।
প্রজাপতি, ভীরু তুমি, এসো না এসো না এই ঘরে
তোমার এই ক্ষণিক সফরে
আমি বড় ক্লান্ত হই, তোমাকে পারি না হাতে নিতে,
পারি না তোমার রক্তে একটি আকাশ ভরে দিতে
তাই একান্ত নিভৃতে

বলি শোন, ডেকো না, ডেকো না মন তাকে
ক্লান্ত সায়ন্তন সুরে শুধু বিষ বিষণ্নতা হাঁকে
ফেরি করে অন্ধকার রাত্রির ডানায়।

কী লাভ প্রচিত চেষ্টা পুনরায় যদি নিবে যায়।

শোভন সোম

(১৯৩৪)

নিঃসীম

দগ্‌দগে সেই পুরোনো ক্ষতে জ্বালা
বুকে বিষের নীল
দু'ভাই তোলে দেয়াল যাতে পরস্পরের না-ভাখে আর মুখ
ওদের হাতে আপন বুকের রক্ত লেগে আছে।

নদী-মানুষ-মাটি সবই দ্বিখণ্ডিত,তবু
অমল আকাশ উপরে অবিকল।

ধ্রুব

॥ আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতঃ ; ঋগ্বেদ ॥
চোখ মেলি : আমি তারই প্রাণ যে আমার-ই
প্রাণ ধারণের অন্ন দেয়, স্নিগ্ধ বারি
যার করে শরীর শীতল।

চেতনার প্রথম উন্মেষে
আমিই ছিলেম স্থিত, অজ্ঞানের বধির প্রদেশে
আমারই আদিম সত্তা ছুঁয়েছিলো, পেয়েছিল অমৃত-আলোক-
আমিই প্রথম মানবক।
আমার অনন্ত কেন্দ্রে বৃত
প্রজ্ঞায় বিধৃত
বোধি জ্বালে অকম্পিত শিখা।

শোভন সোম

আমি সেই পরিপূর্ণ ফল—
আমি এই মৃত্তিকার—হাওয়ার—জলের সম্মিলন
আমিই কালের নিত্য বহমান বর্তমান,
অতীতে ও ভবিষ্যতে ব্যাপ্ত চিরদিন
এ-পৃথিবী আমাতে বিলীন
আমি তার বৈজয়ন্তী, তার ভালে আমি জয়টীকা !

সিলভার ওক

মাটিতে মাটিতে প্রীতি দেশি ভিন্নদেশি
এক সূত্রে গাঁথা
একই হাওয়া বৃক্ষ হতে বৃক্ষে প্রবাহিত
শিকড়ে শিকড়ে একই প্রাণরস স্নিগ্ধ সঞ্চারিত
স্নেহময়ী বসুন্ধরা মাতা—
সহজ প্রাণের টানে এ-ওর স্বচ্ছন্দ প্রতিবেশী।
একই আকাশ ঊর্ধ্বে, শ্যাম শুভ্র মেঘের সম্ভার
উজ্জ্বল ঘনিষ্ঠ দিন, রজনী নিবিড় অন্ধকার—
তবে কিনা কেউ আছে এখানে, ওখানে আছে কেউ,
কেউ খর শুকনো মাঠে, কেউ গোণে সমুদ্রের ঢেউ
ঝিরিঝিরি হাওয়ার দোলায়—
কুসুমের সমারোহে কেউ মাতে ঋতুর লীলায়—
প্রাকৃতিক পরিবেশ ভিন্ন
একই জল হাওয়া আর আলোর অসীম দাক্ষিণ্য
সমতায় ঝরে
পাতায়—শাখায়—আর অন্ধকার গভীর শিকড়ে।

আমার জানালা খোলা—সামনে ঐ শিশুতরু সিলভার ওক
থর্‌থর্‌ পাতায় হাওয়া গাঁথে মুগ্ধ মর্মরিত শ্লোক—
নিবিড় বৃষ্টির মত আলো
অকৃপণ ধারে ঢেলে আশ্চর্য সকাল তাকে হঠাৎ ভরালো।
আমার দেশের শীত দিলো স্নেহ পারে যতটুকু
হিমের আঙুলে প্রীতি ঃ যেন মা'র কোলে ছোটখুকু—
আর
সবচেয়ে অবাক হবার
সে আমার ছন্দে হলো বৃতা ঃ
বাঙালী কবির কণ্ঠে উচ্চারিত উজ্জ্বল কবিতা !

দিন পেরিয়ে দিন

ওরা আমায় একলা ফেলে কোথায় চলে গেলো
মুখ ফিরিয়ে ! দিন পেরিয়ে অসংখ্য দিন এলো
ওরা আবার ফিরে আসবে কবে !

দিয়েছিলো ওরা আমায় অনেক কিছুই, রাখতে পারিনি তো
ছোট্ট মুঠোয় যা ছিলো ঈপ্সিত।
ছায়ার মত অমোঘ ঘোরে সঙ্গে বিপুল স্মৃতি
বর্তমানের চতুর্দিকে সীমার পরিমিতি
শামুক মন গুটিয়ে যায় আশার অভিভবে।

কত রঙীন মেঘের পাহাড় ওঠে আবার পড়ে
মন কেমন করে আমার কত ঋতুর ঝড়ে
চেনা মুখের অনেক ছবি হারিয়ে গেছে ভীড়ে
সবাই যায়, কেউ আসে না ফিরে !

শোভন সোম

দিন পেরিয়ে দিন চলে যায়, স্মৃতির মৌন-কথা
বুকের ভিতর জাগিয়ে রাখে গভীর আকুলতা ।

সজনী তোর গানের টানে

সজনী, তোর গানের টানে ফিরে এলাম আমি
আকাশ জুড়ে বাতাস জুড়ে গান
আকাশ জুড়ে বাতাস জুড়ে টান
আমি পাগল কুম্ভীপাকে কোন্ অতলে নামি !

চোখ পুড়ছে বুক পুড়ছে পুড়ে মরছি আমি
ঘর পুড়েছে তুই জানিস কি তা—
শয্যা আমার গন্‌গনে লাল চিতা
এত তাপেও হলাম না রে হিরের মত দামি !

অঙ্গ আমার জুড়াবে কোন্ অমৃত ধারা স্নানে
চতুর্দিকে বিপুল সর্বনাশ
দুকূল খা খা মরা কোটাল মাস
এতদূরের পাড়ির পর দাঁড়াই কোন্ খানে !

সজনী, তোকে রাখতে চেয়েছিলাম বুকের তলে
বুকের চেয়েও নিবিড় ধমনীতে
রক্তে আর কোষের নিভৃতিতে
ভরেছে দিন অরুন্তুদ কামের কোলাহলে ।

সজনী, তোর গানের টানে ফিরে এলাম আমি
জন্ম-নাড়ির মতন স্মৃতি টানে
বর্তমান ভাসে স্মৃতির বানে
আমি নীরব-অবীক্ষিত স্মৃতির অনুগামী।

সজনী, আমি জ্বেলেছিলাম নীল বাসনার জ্যোতি
সেই আগুনে পুড়েছে তুই চোখ
এনেছে ডেকে অপাশ্রিত শোক
অস্তবেলা অন্তরালে সাধে রে অবরতি

সজনী, তুই গানের টানে ফিরালি অপরান্তে
যৌবনের কুটিল সংগ্রামে
কামনা আমি রেখেছিলাম বামে
শান্তি, আজি শাস্তি দেরে তোর স্মৃতির প্রান্তে

মৈহার অরণ্যে রাত

স্পট লাইটে বিঁধে গেলো চিত্রল হরিণ
গুলির নিষ্ঠুর শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে বেজে বেজে
হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো—কিছু ধোঁয়া, গন্ধ বারুদের—
আশ্চর্য অব্যর্থ লক্ষ্য মিস্টার ঘোষের,
তারপর ফ্লাস্কের কফি, টিনের বিস্কিটে আয়োজন।

আমিও কী এই রাত্রে অরণ্যের শরিক একজন!
অচেনা বিচিত্র শব্দে ঘুরে ঘুরে দ্রব অন্ধকার
গলে' গলে' ফেরে যন্ত্রণার
যূপ কাষ্ঠে বলি হওয়া দিন।

শোভন সোম

শ্রাবণে নাকাড়া বাজে বিন্ধ্যচূড়ে মেঘের মিছিলে,
গ্রীষ্মের দুর্বার লু-তে আগুনের লোল-জিহ্বা গিলে
নেয় তাকে ; শ্বাপদের ঘ্রাণ,
বিভীষিকা পায়ে-পায়ে ঘোরে।

—জানেন, মিস্টার সোম, শিকারের এ হেন আরাম
ধারে কাছে আর নেই ; কিন্তু এর খোঁজ রাখে কে যে !
আপনি এলেন তবু, সত্যি, বড়ো আনন্দ পেলাম।
আসবেন নিশ্চয়ই ফের, ছুটিছাটা যখনি পাবেন !
চলুন, এবার নামি ; দু'টা দশে সাত্‌নার ট্রেন।'
দ্রুত জীপ ছুটে চলে, লাল ধুলো পিছু তাড়া করে।

আমিও কী এতক্ষণ অরণ্যের ছিলাম শরিক !
দৃশ্য ভূমি স্পষ্ট হলো, উজ্জ্বল আলোয় খুললো দিক
আরেক দিনের প্রান্তে অরণ্য দাঁড়ালো পুনর্বার।

এই খণ্ডে আমি এক চিত্রল হরিণ—
কে নিষাদ পিছু পিছু ঘোরে রাত্রিদিন !
যেখানে আলোর মোহে থামি
সেখানে অলক্ষ্য মৃত্যু ভয়ের নিশ্চিত অনুগামী—

পায়ে তাই চঞ্চলতা, বাঁচবার বাসনা বুকে জ্বলে অনির্বাণ !

সামসুল হক
(১৯৩৬

নক্ষত্রের মৃত্যু

কল্যাণী ধানের শিষে রৌদ্রেরা শেষ স্বরলিপি
লিখে দিলো শুভ্র শব্দে—নক্ষত্রের মৃত্যু হবে কাল।

ইরাবতী সন্ধ্যালগ্নে তুলসীমঞ্চে একা নিরিবিলি
প্রার্থনায় নম্র হয়ঃ দয়াময়, এই গৃহে নামে যেন
শংখশুভ্র আগামী সকাল।
তুষ্টু প্রণবটাকে ভাল রেখ—ওঁকেও মংগল কোর
হে মংগলময়।…
প্রদীপের শান্ত নীলে শুচিগন্ধে পাপড়ি মেলে অশোক চিন্ময়।

ইরাবতী আঁকে আজ কল্কাপেড়ে শাড়িটির রূপ
পুকুরের শাপলা ফুল…বকফুল…ফুল-ফুল তার ফুল দেহে;
ভেঙে ভেঙে শিল্প হয় রাঙা ঠোঁটে তুই খানি চুপ…
পান হাতে ইরাবতী উধাও উধাও বুঝি মেঘে মেঘ বেয়ে।

আশ্বিনের নর্মরাতে কাঁচপোকা কতদূর—কতদূরে ডাকে,
জারুলের স্নিগ্ধ ডালে জোনাকিরা জরি প'রে ওড়ে উৎসুকে,
শিশিরের শরতের মালকোষে মিড় তোলা,
সেই ফাঁকে ফাঁকে
তারকারা ইরাবতী নাম ধ'রে নামে নামে নামে
এই [illegible] বুকে

সামসুল হক

দু'টি চোখে দু'টি মন

পৃথিবী আঁধার হ'লে তুমি যেন তারার শরীর ঃ
বেদনায় নম্র হ'য়ে যার ফুল আমার হৃদয়ে
ঝ'রে গিয়ে স্থির হয়,—
অযুত বছর ধরে—অযুত নিশীথ ধ'রে—অযুত নারীর চোখে
বাংলার ছবি
ভেসে উঠে ভেঙে যায়—ভেঙে ভেঙে হঠাৎ কখন
তারা হ'য়ে ফুল ফোটে—যে-ফুলের হলুদ পরাগে
বেদনা অমৃত হয়—হ'য়ে ছিল কতো যুগ আগে ॥

অরণ্য-নিবিড় স্বাদ বেদনার নীলে,
কতো ভাল : কতো ভাল তোমার আমার
পাহাড়-চোখের নদী। নিভৃত দুয়ার
রেখে বুক ভাঙি— অপরূপ মিলে।

এই শেষ। শেষ মাটি জড়িয়ে দুহাতে
শেষ সাধ পূর্ণ ক'রে কেঁদে যাব রাতে ॥

ঝরনা বেগম

নীল চোখে কতো বিষ। কতোবার ময়নাদীঘির
জরিমাছ একডুবে কলমী লতার বেদনায়
ভেসে ওঠে ঃ ঝরনা বেগম ঘাটে নীল চোখে স্থির ঃ
একটি মালিনী সাধ ঝুলে আছে চুলের খোঁপায়।

নীল চোখে কতো নেশা।   কতোবার ঝড়ের দোপাটি
বুকে নিয়ে বেঁচে গেল : একটি শংখঘুম তার
হাতে ধরে নেমে এলো—ঝুম্‌কো লতার মতো মাটি
ছোঁয়া দিয়ে তারপথ গন্ধে ভরালো একবার।

সেই তার শেষবার : এই ঘাটে নীল চোখ নিয়ে
দাঁড়াবেনা ঋতুগন্ধা সেই মেয়ে ঝরনা বেগম।
বৃষ্টির নূপুর শুনে কেউ যদি ডাক দেয় গিয়ে,
ভুল হবে, ভুল করে পৃথিবীর ভাঙবে নিয়ম॥

কিংবা উদ্ধৃতি

প্রেমের মতো শরীরী সে, তবুও প্রেম নয় :
সহগ গুজন মনের অন্বয় ;
পথে এবং পথের সাথে পদক্ষেপের হাসি
উজ্জ্বলতা চোখে মনে ছড়ায় বকুল রাশি।

প্রেমের মতো রূপসী সে, তবুও সংযত :
মেলট্রেনটার সিটি বাজে, মেনী বেড়াল বুকে,
শ্রেণীবদ্ধ অকল্যাণ অধীর উদ্ধত,
ঠেকিয়ে রাখে (কি যে ভাল) গোপন উৎসুকে

মালতী দেবী গত রাত্রে বেড়াল হতো যদি॥

মধুমতী

সেই যে মায়াবী ভোরে নিদ্রানীল নীল পাখী এসে
আমাকে জাগিয়ে গেল : সাঁওতালী মেয়ে যেন হেসে
হিজলের পাতা ছুঁয়ে পাহাড়ের আকাশে মিলালো :
আমার বিনম্র বুকে সেই ডাক—সেই নীল আলো।

পৃথিবী যখন ছিল জল, জল আঁধারের ঘুম,—
আমার মেরুন পাখী বলে গেল ঃ জন্ম তার সেইখানে
নীরব নিঝুম।

তারপর কতোকাল : পৃথিবীর সোনামুখী মেয়ে
সোনালী যৌবন পেতে গায়ে টানে কিশোরীর শাড়ী
মেদুর শাওন জলে : ঠিক যেন নব তনু ছেয়ে
কুমারী ফোটাতে চায় ভীরু লাজ, রূপ রেখা যা'রি
প্রতিটি তারার রঙে ভরে দিতে চায় তার মন :
পউষে ধানের দিনে সেই মেয়ে সোনালী তেমন।
এই ডাক শুনে শুনে পুরাতন হ'য়ে গেছে কবে,
তবুও আমার পাখী কই এলো—শিশুগাছে—ভোরে।
কে যেন বললো ওই ঃ আসবে সে, আসবে সে কাল ;
মধুমতী প্রেম নিয়ে দেখা দেবে আগামী সকাল॥

স্বপ্নসাধ

পুকুরের ভাঙাঘাট আধভেজা তালকাঠে বাঁধা
সবচেয়ে শেষ সিঁড়ি জলে ডোবা, একটা ঝিনুক
সবুজ শ্যাওলা প'রে শুয়ে আছে। দু'টো বড় গাঁদা

ফুটে আছে পাড় ঘেঁসে। সেই ঘাটে একখানি মুখ
দেখা যাবে—মাথায় কাপড় দিয়ে শ্যামলী ত্বহাতে
চাল ধোয়। একটা ফড়িং শুধু বারে বারে এসে
বসে আর উড়ে যায়—হয়তো বা ওড়ে সেই সাথে
শ্যামলীর কোন আশা—উড়ে উড়ে যায় সেই দেশে ঃ

যেখানে শ্রাবণ মাসে কোন এক কিশোরের গান
মাঠ থেকে ভেসে আসে। সন্ধ্যায় কুঁড়ে ঘরে ফিরে
খোলে—কিশোরের কতো অভিমান
ধুয়ে দিয়ে তুলসীমঞ্চে এক শাঁখ বাজে ধীরে।
তারপরে চেয়ে দেখে ভেজা চালে ওঠে নীল ধোঁয়া।
ঘরের প্রদীপখানি কে কখন দিয়ে গেছে এসে,
মুগ্ধ কিশোর জানে জ্বেলেছে কে,—কোন হাতের ছোঁয়া
পেয়ে আজ লক্ষ্মীর ঝাঁপি হয় বাংলার দেশে॥

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

(১৯৩৬)

নোঙর

সাগরের লোনাজল শেষ হয়ে আসে,
এক দুই গুনে গুনে সব ঢেউ সরে গেল দূরে।
মিষ্টি জলের গন্ধ ছড়ালো বাতাসে,
শঙ্খচিলের ডানা
আকাশকে সাত পাক ঘুরে।

এইবার পলিমাটি জনপদ নগরীর ভিড়
নারীর প্রাণের মত স্নিগ্ধ নিবিড়;
কাঁকনের মধুমিড়ে বাউল পথের শেষ,
মোহনায় ফিরে কি এলেম!
শিশু : গৃহ : প্রেম—
ত্রিবেণী তীর্থে ওঠে কী বিচিত্র মিড়।

খড়ো ঘর, আম জাম আর ঝাউ বন,
মনের আকাশে বুঝি তারাই এখন
নোঙরের স্থির শুকতারা ;
শতাব্দীর পার হ'তে আজ পেল ছাড়া—
আকাশে বাতাসে শুনি তারই কানাকানি।

একটি নারীর চোখ স্থির হাতছানি॥

প্রত্যাবর্তন

একটু আলো একটু ছায়া বৃষ্টি নামে ফের
বৃষ্টি নামে আকাশ ভেঙে গহন হৃদয়ের
কাজল কালো মেঘ সরিয়ে এক মুঠো রোদ আলো
কন্যা, তুমি এইখানে ফের ঢালো

কন্যা, এবার বন্যা আনো, স্বপ্ন আনো সেই সাথে
আকুল করা হাসনাহানার গন্ধ ঝরা শেষ রাতে
এই আকাশে আবার আনো হাওয়ার স্নেহ ভোর সকাল
আবির আলোয় পথিক বধূ এই পথেতেই হোক মাতাল
আষাঢ় সুরু বৃষ্টি এলো সময় হলো তার আসার
ছায়ার পাশে এবার জ্বালো চোখের তারার দীপ তোমার

কথাও হারায় চোখের লীলায় হারায় তোমার স্বর
সবুজ মনের আলতো ছায়ায় একটুকু স্বাক্ষর
থৈ থৈ জল অথৈ যুগের ছায়ার গভীরে
হারায় কথা দূর সুদূরের মৌন শিশিরে।

উত্তরণ

কথার অকেজো জাল বুনে বুনে কি বা লাভ ব'লো,
তার চেয়ে এ-মাটির সীমানা পেরিয়ে হেঁটে চলো
অনেক, অনেক দূরে সাতরঙা রামধনু দেশে—
যেখানে আমার মন তোমার সাগরে গিয়ে মেশে।

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

টুপ্‌টাপ্‌ পাতা ঝরা, ঝিরি ঝিরি ঘন ঝাউবন ;
মনিয়ার ঠোঁটে ঠোঁটে কেঁপে ওঠা নীল-নির্জন,
কথাকলি ঝর্ণার মণিপুরী আলাপের সুর,
সেখানে উঠুক বেজে তোমার এ-সুমিত নূপুর।

সে আকাশে কেউ নেই, এমন কি রাতের তারাও
তবুও সেখানে আছো তুমি, আর আমাকে ছাড়াও,
প্রথম পৃথিবী থেকে এ-সত্তার অবিসর্গী প্রেম ;
তাইত' আরেক রূপে তোমাকেই আবার পেলেম।

একটি সনেট

পথে আর কেউ নেই, রাত তো অনেক
তারাটির মত আজ নীল মন নিয়ে
আকাশে অনেক গান দু'হাতে ছড়িয়ে
মন বুঝি খুঁজে চায় স্বপ্ন আর এক
হয়তো বা এ-ও কোন মানস-বিলাস
অর্থ নেই তবু সেই অজানা এষণা
মায়ামৃগ-মন ওগো তুমিই বলনা
কতসুরে ভরে রাখ তোমার আকাশ।

যুগ যুগ ধরে যেন এই অন্বেষণ
নিজেকেই ঘিরে ঘিরে কি বিচিত্র মিড়ে
গভীর বিস্ময় নিয়ে হায় এই মন
আপন ছবিটি আঁকে রোজ ঘুরে ফিরে
কুমারী মেয়ের মত ব্যথা ভরা প্রেম
আমাকে আপন করে তবু কি পেলেম।

পৌত্তলিক

চোখের জল জমে জমে সাগর হতে পারে,
কি লাভ হবে সে সব কথা ভেবে ;
হাজার কথা ঝরে ঝরুক আরেক অন্ধকারে
যার প্রয়োজন সেই কুড়িয়ে নেবে।
অনেক ভেবে দেখেছি আমি ঠিক
বাঁচতে গিয়ে হঠাৎ যেন হলেম দার্শনিক।

মেঘের ভারে আকাশ থরো থরো,
হাওয়ায় হাওয়ায় ব্যথার গুমরানি ;
—'আজকে তুমি আমার চেয়ে বড়ো'
নিছক একি সান্ত্বনারই বাণী ?
বিচার করে দেখেছি আমি ঠিক
তোমার প্রেম হৃদয়ে রেখে হয়েছি পৌত্তলিক।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

(১৯৩৮……?)

প্রথম প্রত্যয়

এ জীবন স্যাঁতস্যেঁতে, শুধু ক্লান্তি ; তবু এর আলো
ভরেছে সমস্ত মাঠ । জীবনের অসীম অন্বেষা
হ'ল শেষ এতদিনে ; নীড়মুখী কপোতের এষা
আমার হৃদয় ভরে । এ-পৃথিবী লাগে বড় ভালো ।

আমি এক ক্লান্ত প্রাণ, 'জীবনের সমুদ্র সফেনে'
বাইশ বসন্ত গেছে : দিগন্তের সেই উপকূল
হাতছানি দিয়ে দিয়ে নিয়ে গেছে সেই দিকে টেনে ।
ফলের পূর্ণতা আজ পেয়েছে সে-প্রাণের মুকুল ।

তমসার পার হতে জ্যোতির্ময় সূর্য-সম্ভাবনা
প্রত্যক্ষ করেছি আজ সাগরের বেলাভূমি তটে,
রক্তিম ভোরেরে জানি কিছুপরে আর তো পাব না ।
মুহূর্তের এই প্রেম তবু থাক হৃদয়ের পটে ।

বিপ্রলব্ধ

তোমার সমস্ত সত্তা সে শুধু আমাকে আছে ছেয়ে
যন্ত্রণার মর্মদাহ, বুকে নিয়ে বিষাক্ত শায়ক ।
নরম নদীর মত কী আশ্চর্য, কোন এক মেয়ে
বালুচরে প্রতীক্ষায়, আমি এক নিঃসঙ্গ নায়ক ।

সেই তো আশ্চর্য রাত ! অন্ধকার মাঠ-নদী-বন ।
কী দুর্মর স্মৃতি সে তো বেদনার ডানা দুটি মেলে
ঘিরে ফেলে চেতনারে, মৃত্যুহীন সারা দেহ-মন
চলে যায় তারপরে বেদনার দীপখানি জ্বেলে ।

প্রত্যাশা

ভোরের সূর্যের মত জানি তুমি মেলে ঘুম-চোখ
একটি দিনের দিকে তাকিয়েছ ঃ মনের সেতারে,
বিলম্বিত রাগিণীরা আসে যায় । প্রভাতী বেতারে
সাহানার সুর ভাসে । বেশ লাগে মন্দাক্রান্তা শ্লোক ।

তখনই তো অন্তহীন কোন দূর ধূ-ধূ বালুচরে ।
অথবা সংক্ষুব্ধ নীল সমুদ্রের মহা-কলতান,
কান পেতে আমি শুনি, কী দুর্জয় জীবনের গান !
নরম মাটির ঘ্রাণ নিই আজ শুধু বুক ভরে ।

প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ভগ্নাংশের আংকিক হিসেবে,
ধোপার রসিদ আর গোয়ালার যত কিছু দেনা,
মাসিক কিস্তিতে এই সাংসারিক টুকিটাকি কেনা !
তোমার সমুদ্র-মন, আমি চাই, কিছু বেশী দেবে ।

মনের ইজেলে

এই নদী, এই মাঠ, অবাক এ-গাছগুলি সব,
তৃষিত হৃদয় দিয়ে বার বার করি অনুভব ।
এ-জীবনে রঙ লাগে বারে বারে উঠি তাই জেগে ।
এ-পৃথিবী প্রাণ পেল আমার চলার গতিবেগে ।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

এ-ভোরের রঙ লাগে চিলেদের সোনালী ডানায়।
প্রভাতের শিউলিরা বার বার স্বাগত জানায়,
তুলো-মেঘসাগরেতে তাইতো আজিকে তারে খুঁজি।
এ প্রভাতে জমা আছে গড়ে তোলা জীবনের পুঁজি।

এ ভোরের আশাবরী, গোধুলির বিষণ্ণ পূরবী।
ম্লান, ছিন্ন করে দেবে—এই সত্য জানি তার সবই।

এ-রূপ-সাগরে তবু ক্ষণিকের ডুব দেই যদি,
সেই ভাল ; তারপরে বয়ে যাক সময়ের নদী।

রেখা দত্ত

(১৯৩৮)

বৃষ্টি ঝরে

বৃষ্টি ঝরে—বৃষ্টি ঝরে
ঝিম ঝিম ঝিম সারাক্ষণ। রুদ্ধঘরে
একা একা বসে আমি। গাঢ় অন্ধকার
আপন আঁচলে ঢেকে নিল ত্রিসংসার।

নিঃশ্বাস-স্পন্দন-শূন্য স্তব্ধ দশ দিশি,
নিষ্কম্প-প্রদীপ মনে জেগে সারা নিশি
ভাবি বসে বসে—
ভেঙেচুরে টুক্‌রো হয়ে যারা গেছে খসে
এ-জীবন হ'তে
যদি পারি কোনো মতে
তাদের স্মৃতির ম্লান রেশ
এই রাত্রে করে সমাবেশ
জোড়া দেব।
শত চেষ্টা-শেষে
তন্দ্রাবিজড়িত চোখে, ব্যর্থ ভাবাবেশে
একটু জোড়ানো হলে পিছে চেয়ে দেখি
পুন সব গেছে ভেঙে!
মূঢ়-মেকি সে কী
লক্ষ চিন্তা আসে-যায় তারই ফাঁক দিয়ে
হঠাৎ তুমিও এসে উঁকি মারো প্রিয়ে।
মনে ভাবি, বলে ফেলি এই শুভক্ষণে, রাশি রাশি—
নির্জন প্রহরে—'ভালবাসি, তোমাকেও ভালবাসি!'

সূচীপত্র

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী

স্মরণে

সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত

(১৯১৭)

তীর্থনীর ॥

খাঁ খাঁ রোদ্দুরে তপ্ত পথের ধুলো
হাঁ-করা এ-মাঠ শত জিহ্বায় জ্বলে
তামাটে কালোয় ছড়ানো এই খোয়াই
লোহা হয়ে আছে এ-মাটির পিঠ পুড়ে

বিরল-তরুর এ-মাঠে তালের সারি
যেন জাগ্রত কঠিন লোহার থাম
মাথায় সবুজ আগুনের শিখা জ্বলে
কঙ্কালীতলা ঐ দেখা যায় দূরে।

ওখানে কোপাই ছায়া-ঢাকা তার তীর
চলেছে ব্যাকুল তীর্থযাত্রী দল
জানে পথ দূর, তবুও পথের শেষে
আছে মন্দির ক্লান্তির শেষ হবে।

তৃষ্ণায় তুমি কে দাও দ্রাক্ষারস
পান্থ-পাদপ মরু-পথিকের তরে!

উত্তরণ

রহস্যের কিছু থাক, খুলো না অন্তিম যবনিকা
কী হবে ছড়িয়ে মুক্তো আমাদের এই উলুবনে

তুমি দেবে ফুলহার ছিন্ন হবে চকিতে সে-ক্ষণে ;
আবরণ ছিন্ন ক'রে আলো তবু দাও বারে বারে।

হয়ত তোমার আশা ঋজু ধাতু কঠিন ইস্পাতে
সৃষ্টির অমোঘ দুর্গ উচ্চশির তাকাবে আকাশে
শিলাখণ্ডে চারুমূর্তি দীপ্ত হবে অমর্ত্য উদ্ভাসে
তোমার সৃষ্টির পথ খুঁজে পাবে মানব-শিল্পীরা।

তারা-তো জ্বেলেছে আলো ; তবু এক জড় অহঙ্কার
অদ্ভুত শরীর নেয়—তারি সেই ছায়া—অন্ধকারে
পিশাচের নৃত্য চলে স্বর্ণলঙ্কা জ্বলেছে হাজার
যত তুমি আলো দাও, তারা চলে অমেয় আঁধারে।
তোমার সৃষ্টির নদী নিরবধি কোটি কল্প শেষে
চলেছে আশ্চর্যধারা, উত্তরণ সে-কোন নিমেষে ?

বিজ্ঞানময়

বুক চিরে দেখো তুমি, সে রয়েছে, প্রত্যয় না হয়।
কেউ বলে অন্তর্জ্বালা, ভালোবাসা, বিপুল যন্ত্রণা।
সত্তার সর্বস্ব ধন, অগোচর অনুক্ত অব্যয়—
অভিধার পরাভব ; তাই চির কবির কল্পনা।
আত্মার অমর্ত্য দীপ অন্ধকারে জ্বলে হিরণ্ময়।

এখনো তারেই করি নির্দ্বিধার শেষ ধ্রুবতারা
নীড়চ্যুত বিহঙ্গেরে সে-ই শেষে দেবে যে আশ্রয়।
নীল শূন্যে তুমি ছোটো অদর্শন তারার ইশারা—

তুমি চাও ধরা দেবে ছকে আঁকা জড় আচরণ
বুদ্ধির নিয়মসূত্রে ; সঙ্গোপন গ্রহ-গ্রহান্তরে
স্বপ্রকাশ সত্য হবে। আমারো সে অসাধ্য সাধন।
তবু সে বিচার মূঢ় যে হল না আত্মায় ভাস্বর।

কত না রেখায় আঁকি অগোচর অন্তর্লীন জ্যোতি
প্রত্যন্তের চিহ্নহারা সুনিবিড় আত্মার আয়তি।

দুই তীর

আকাশে বিকেলে উঠেছে দুই শিবির
শেষ-সূর্যের আবীর জড়ানো পাড়ে
ঐরাবতেরা শুঁড় তুলে চারধারে
সহসা ছড়ায় উর্ধ্বে ঘন তিমির।

শান্ত বিকেলে এ কী প্রমত্ত ঝড়
ব্যাকুল আকাশে ত্রস্ত পাখিরা ফেরে—
সাঁওতাল মেয়ে দল বেঁধে কাজ সেরে
দ্রুত পায়ে চলে, পারুলডাঙ্গায় ঘর।

বারে বারে তুমি জীবনে ছড়াও ভয়
তবুও সন্ধ্যা, তবু যে নীড়ের টান—
হৃদয়ের ঝড়ে নেই কি পরিত্রাণ
শেষ সূর্যের স্তম্ভিত বিস্ময় ?

আকাশে বিকেলে উঠেছে দুই শিবির
দ্বিধা-কম্পিত হৃদয়ের দুই তীর।

ল্যান্‌স্কেপ

ছবি-ভরা আকাশ
চেয়ে চেয়ে দেখি—
আর নীচের দীর্ঘ তরুর অরণ্য।
নানা রঙের আলো মেখে
কখনো হালকা, কখনো ঘন সবুজ তারা
আবার ডুবে-যাওয়া অন্ধকারে
একাকার ছবি আর রঙ্।

রাতের গুণ্ঠন খুলে
এক মুখের মৃদু হাসি
অরণ্যের কপালে এসে লাগে।
হাসতে হাসতে মেয়েটি আকাশের সিঁড়ি ধরে।
তার যাবার পথে
আবার আকাশ-ভরা আলো
আর ছবি-ভরা অরণ্য।

ধারা

জানে নি সে, কিছু জানা থাকবেই বাকী
স্মৃতি আর চঞ্চলতা, মুখর নদীর মত গতি
থেমে যাবে ; জানতেও পারবে না সে-কি?

তন্বী মেয়ে থুড়থুড়ে তখন অশীতি
স্থবির রজনী এক ; অচেতন ঘুমে
ডুবে যাবে—স্বপ্ন-সাধ-লীলা যথারীতি

সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত

তবুও যে শেষ নেই পথের ইশারা
অনাদি কালের থেকে এই বিশ শতকের শেষে
আনন্দ ব্যথার ঢেউয়ে ভেসে আসে তারা।

কী গভীর অনুভব ; তবু মৌন একা তার প্রাণ
চেয়ে থাকে স্থির দৃষ্টি, আবার কী ভেবে নিয়ে চলে
সমস্ত সত্তায় মিশে—এক হতে—ভুলে যায় গান ;

মৃত্যু আসে, আনন্দিত অনুভবে তবু আলো জ্বলে
হৃদয় হৃদয়ে নেয়, অনিঃশেষ আজো পথ চলে।

সুনীল চট্টোপাধ্যায়
(১৯১৯)

শেষ কন্যা

সাতেমেঘেএক এই ছায়ায় আবার
ডুবে যাই জলে-ভরে-যাওয়া কী অতলে,
যেখানে মেঘের কন্যা কালোচুল রূপকথা হ'য়ে
আঙুলে বাজায় জল, সুর তার যায়নাকো শোনা,
কেবল বিজন কোনো ঝাউবনে নীল
ধ্বনি তার ভেসে যায় মেঘলা বেলায়।

হায় সাতেমেঘেএক দিন!
আমাকে ডুবালে যদি তবে কেন ভাসাবে আবার
ঝাউয়ের গানের পিছে, যে-গানের মোহানা তো আমি:
পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি, ডুবে গিয়ে তোমার কন্যার
আঙুল-ছোঁয়ানো জলে, যে-জলের লেখায় আমার
এ-জীবন শুধু তার কালোচুলে মুছে ফেলবার।

আমি তার চোখের নিচের,
—হায় তা অনেক ভরাডুবির আদল—
যদি জল হ'য়ে যাই তবে দুটি ঢেউয়ের আঙুলে
আল্‌তো তুলবো তার চিরকাল-কাঁদানো চিবুক,
হাজার ঢেউয়ের বুকে মুখখানি ভেঙে ভেঙে নেবো,
হাজার ঢেউয়ের বুকে ঠোঁট তার রক্তপ্রবাল,
আঁখিমণি ইন্দ্রনীল, টলোটলো মুক্তার কপাল
অবিরল ছেয়ে যাবে, কেঁপে কেঁপে ভেঙে বারবার,
বুকেরগভীরব্যথা কালোচুলে সব একাকার।

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

ওগো সাতেমেঘেএক দিন !
দয়ায় ডুবালে যদি ভাসায়োনা আমাকে আবার
ঝাউয়ের গানের পিছে ;
ও-গানের মেয়ে নয় এ-ছায়ায় আমার অজানা,
আমার জীবন তার চোখে-চোখে রয়েছে জাগানো,
আমার অনেক কথা ঠোঁটে তার নিস্তব্ধতা হ'য়েছে বাঁকানো,
আমার নিয়তি নিয়ে আঁকা তার কুমারী কপাল,
তার-ই চোখের নিচে জলে আমি জলের লিখন
যে-লিখন হেলাভরে চুলে তার মুছে ফেলবার ।

বসন্ত আলো

কী শুভ্র দেবতা সূর্য, বসন্তে বিকেলে
দেখেছ দুচোখ মেলে !

যেন তিনি বুকের দুয়ার
এই খুলে বেরুলেন । সমস্ত অস্পষ্ট গুরুভার
কী লঘু, কী অভিষিক্ত ! প্রাণজোড়া আকাশবাসনা,
এক সূর্য-অশনায়া, চারিধারে শুভ্র ফেন-কণা ।
শুভ্রতার সমুদ্রের বসন্তের দেবযান ডানা
করুণার বাসুদেবে ঘিরে তাঁর ধ্যানে দেয় হানা ।

শরীর মুচড়ে শাদা দুধরাজ স্থির ফণা ধ'রে
অপলক চোখে আলো পান ক'রে থলি ভ'রে তোলে,
সবনবিহ্বল এই যজ্ঞময় বসন্তপ্রহরে
গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে আলো পাক খায়, সব ওঠে ট'লে ;
বসন্তে সর্বস্ব শুভ্র, সারিগান, রোদ গোলাভরা ।

দিব্যফসলের ঝরা, ধবলীর দুধে-ধোয়া চরুমাখা সরা।
আলোর কামুক বুক আকাশের এপার-ওপার
ইঁদুরের মত কোরে, মোড়ে-মোড়ে শ্বেত-সিংহদ্বার
আলোর উৎসবে খোলে ; সারা গায়ে কেবল আকাশ,
সারা গা ধানের গান, প্রাণে-প্রাণে একটি নিঃশ্বাস।

সারান্দা বনে

যৌবন, পাহাড় হও। পলাশবিদীর্ণ খরবেলা
কঠিন শৈলীতে গাঁথো। দক্ষিণার প্রহত কুণ্ডলে
সমুদ্রঝর্ঝর স্বর, সানু ঘিরে গুঞ্জরিত বন
বোলে-বোলে স্তোকনম্রা, মহুয়াউদ্বেল অবহেলা
মর্মরজড়িত পথে,—ট'লেও তা পাষাণের ঢলে
স্থির ঢেউ করে দাও। শালফুলে খচিত কাঁপন

জড়িয়ে দিক না সব রাঙা আভা সোনালি চাদরে
প্রতপ্ত পাষাণটানে অনুস্যূত ক'রে রাখো সব।
যৌবন, তোমার চূড়া মন্দিরের উপযুক্ত স্থল।
কেবল সেখানে তুমি অন্তস্তল উৎসমুখে ধ'রে
কিছু জল তুলে এনো, ফুলফলমঞ্জরীপল্লব
ভিজিয়ে সহজে কোরো বিন্দু-বিন্দু ঝরায় স্বচ্ছল।

যৌবন, পাহাড় হও, বসন্তের বিশাল বরণ
চূড়াস্পর্শী শিল্পে কোরো সম্মানিত, সুদৃঢ়চরণ।

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

উজ্জয়িনী

যেন বিদ্যুৎ হিরণ্য জলে জ্বলে—
তোমার নামের ধ্বনিটি উজ্জয়িনী ;
মণি-মঞ্জুষা খুলে দেয় পলে-পলে
ওই মহার্ঘ উচ্চারণের কাল ;
প্রাণের আড়ালে বাজো-বাজো কিংকিনী
মুক্তার ফল ঝরায় মণির ডাল।

স্বর-ব্যঞ্জনে, রূপগুণে অতুলনা,
মেঘচুম্বী ও-শিখর প্রথিতযশা,
শিপ্রায় আর প্রিয়ায় কলস্বনা,
গ্রথিতচরণ প্রাবৃটে ও মধুমাসে,
বসন্তসেনা, শিখরিণী, মদালসা,
পুব, উত্তর, দক্ষিণ ভ'রে আসে।

মিলিয়েছো তুমি সাধিকা যে-অঙ্গিরা
তার সঙ্গেই প্রসাধিকা অঙ্গুলি,
পাঁচটি আগুনে স্ফুরিত তাপসী-ব্রীড়া,
শৃঙ্গারে-ধ্যানে বিলসিত বাজে বাঁশি,
আজো শোকে-শ্লোকে ওড়ে বর্ণিল ধূলি,
আজো প্রাণ মহাকবির ভারতবাসী।

তোমার চিকন কাঁপানো পাখায় আঁকা
হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী,—দেশ ;
বর্ণবলাকা আজো এ-আকাশে বাঁকা,
আজো প্রাণে-প্রাণে ধ্বনিত তোমাকে চিনি,
যেন বাজো-বাজো তার তুমি, যেন রেশ,
ঝঙ্কৃত মণি-বাষ্পে উজ্জয়িনী।

রাজরপ্পা

বিপুল ধাক্কায় নামো। সরাও পাথর।
পাথরের খাদে নামো। আগুনের ফুল্‌কি হোক জল।
বহাও ফেনিল তোড়। দুঃসহ এ-রুদ্ধতার ঘর।
ফুলে ওঠো রাজরপ্পা, ঝড়, বাজ, আনো মেঘদল।

পলাশপ্রহর তুমি কাটিয়েছো, কৃষ্ণচূড়া বন
দেখেছো ঢালোয়া কালো মেঘের দুপুরে,
এখন কড়কড় বাজে রাজরপ্পা হানো প্রাণমন
গুঁড়াও রুদ্ধতা এই চাঙ্‌-চাঙ্‌ পাহাড়ি নূপুরে।

লাফ দাও রাজরপ্পা, হামানদিস্তায় ভাঙো ঢেউ
মেঘর-ঝাঝর-ঢাল-এ পাড়ে-পাড়ে ফাটাও পাঁজর,
গর্জনে, ঠোক্করে নামো, ধাক্কা ঠেলে না পালায় কেউ,
না হয় চুরমার কোরো, তবু আনো ঘুরন্ত ঘর্ঘর।

ঘূর্ণীপাক পাকদণ্ডী রাজরপ্পা আগত আষাঢ়
ঘনানো প্রাবৃটঘোর অন্ধকার পাথরের খাদ
প্রস্তুত রয়েছে সব বিদ্যুতের আনো শক্ত চাড়
লালকালোশাদা সব পাথরে ঘোরাও সুসংবাদ।

ন জায়তে………

বিশাল প্রলাপে মাতবে অগাধ জ্বর।
তাপ বেড়ে মাটি ভিজিয়ে তা ছেড়ে যাবে।
ঘোর তিনরাতে, মাঝরাতে ;—প্রান্তর
বাইরে তখন গভীর। বেরুবো আমি

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

কুঁড়ে ঘর ছেড়ে ; সিক্ত কপাল, বুক :
জানবোনা কিছু তখনো স্পষ্টভাবে
কী সব রইল ঘরে জ'মে উৎসুক।
ধূমজ্বরে কোন তীরবেগ দ্রুতগামী

জানাজানি সব সাজিয়েছি শৃঙ্খলে।
শুধু বেরিয়েছি একলা ; তখনো ভারি
রাতের পাল্লা। সহসা হৃদয়তলে
বিজনমন্ত্রে বাজে একা মহাকাল

ঘোর তিনরাতে। কুঁড়ে ঘরে জ্বর দ্রুত
মেতেছে বিশাল প্রলাপে। বাইরে দ্বারী
ছিল নাকো কেউ। সব একা, অশ্রুত।
মাঝরাতে শুধু প্রান্তরে করতাল।

কোনো এক খর দুপুরে, কিংবা পরে
বেলা চ'লে গেলে হয়তো ঘরের থেকে
ধ্বনিরেখাগুলো জাগবে পাহাড়স্বরে।
শিকড়ে-শিখরে ঘা মেরে ঘুরবে। তবে

আমি তো তখন প্রায় মুছে-যাওয়া, প্রায়
শূন্যপ্রধান। তারা কী চিহ্ন দেখে
চিনবে আমাকে! জানবে কি, জ্বর-গায়
কী সয়েছি ঘরে! ঘর বা ছেড়েছি কবে!

তক্ষশীলা

সে কী টের পেলো একবন রাঙা ফুল,
শুনলো হাওয়ায় একসমুদ্র ডাক,
সে কী টের পেলো সংযত তক্ষণে
আমার হৃদয়ে তক্ষশীলার ক্ষণ
হঠাৎ নিয়েছে কী সূক্ষ্ম, মৃদু বাঁক ;
সেইখেনে আমি বেঁধে দিই তার কূল,
বেণী বেঁধে দিই, আলোছায়া ঢালি স্তনে।

একবুক জলে, জান্‌তে পেলো সে তা কি,
ডুব দিয়ে এই তুলেছি তক্ষশীলা,
সে কী টের পেলো কত রাঙা ফুলবন
একফোঁটা ক'রে দুঃসহ স্থির বেগে
রক্তমুখী এ অতীব তীব্র নীলা
শিল্পের হোমে জাগরূক করে রাখি,
জানে সে, বাতাসে একসমুদ্র জেগে ?

কী পাহাড় ছুঁয়ে এ-প্রাণ বিবস্বান
তার ঢেউ ছুঁতে জেনেছে জীবনশীল !
সে কী জানে, কোন অনাদিনীরব শূন্য
হাতে ছুঁয়ে তার পা দুটি গড়ার পণ,
অজ্ঞানে তার জোগাতে চোখের মিল
যোগ্যভাবনা মণিপদ্মের পুণ্য ?
সে কী টের পায়, নিজেই সে কোন গান !

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

ভরা আলো

এমন আলো, যেন কোন দুর্লভ পুণ্যতিথির,
সকাল থেকে পথে-ঘাটে আজ ছড়ালো।
যারা কাঁদছিলো মুখ ঢেকে,
ধুলোর সংসার, ছাইমাটি আশা,
ভিজে ভালোবাসায় মুখ ঢেকে
পথে ব'সে যারা কাঁদছিলো,
কোন দূর নদী ডেকে বল্‌ল তাদের :

তীর্থযাত্রার সময় হ'ল হে আমার মানুষের দল !
সেই উদাস সুন্দর লগ্ন এসেছে।
কত যুগ পার হ'য়ে আমি তোমাদের স্নানের জল বয়ে এনেছি,
অগণ্য ঢেউ-এ ঢেউ-এ নিরন্তর জলের নির্মল মন্দির গ'ড়ে ;
কত উপাসনার ভেসে-যাওয়া ফুলের গন্ধ, চন্দনবনের ছায়া,
কত সূর্যস্তোত্র, সন্ধ্যামন্ত্রের উচ্চারণ ধরে রেখেছি বুকে,
তোমাদের গলায় দোলাবো জলের উপবীত,
তোমাদের সর্বাঙ্গে দেব আমার সুচির পুণ্যের পূর্ণ অভিষেক।

হে আমার ব্যথিত তীর্থযাত্রীর দল !
আমি সমুদ্র জানি, সূর্যালোক ; আমি পাহাড় জানি,
বিপুল সময় ;
বিশাল আকাশের ছায়াসকল আমি জানি,
চির-প্রবাহ আমার তবু তোমাদের তীর্থস্নানের পথ-চাওয়া ;
আমি নদী। অনেক আমার অবগাহনের জল।

আর এমন আলো, যেন সেই উদাস সুন্দর লগ্ন।

তীর্থ শিলা

ঝরে যায় অঞ্জলির জল
শঙ্খশ্বেত, শূন্য বেদীমূলে ;
এক তৃষ্ণা কণ্ঠের সম্বল,
ব্যর্থ হবো যদি যাও ভুলে ।

সারাদিন সিক্ত শিলাময়
দলিত যে-আরক্ত চন্দন,
যদি না সে সুরভিত ক্ষয়
হয় কোনো পূর্ণ আলিম্পন ;-

এ-বন্ধনমোচন আমার
তবে তো সদূরপরাহত ;
রূপহীন, শেষ অভিসার
হবে শুধু পাথরে প্রহত ।

অঞ্জলির সাগরের জল,
মন্ত্রময় আকাশের স্বর,
চন্দনের ব্যথিত সম্বল
নাও, রাখি বেদীর উপর ।

শান্তশীল দাশ

(১৯১৯)

দোসরা অক্‌টোবর

একটি হু'টি মানুষ আজো তোমার পথে চলে,
একটি হু'টি মানুষ আজো তোমার কথা বলে ;
তার বেশি নয়, নয়—
তবু তোমার পথটি আছে তেমনি জ্যোতির্ময় ।

পথ চলি না, সৌধ গড়ে তুলি ঃ
নামাবলী অঙ্গে জড়াই ; কাকাতুয়ার বুলি,
দম-দেয়া কল চলতে থাকে—
তা না হলে ভিখ মেলা যে দায় ।
ঘটা ক'রে ঘণ্টা কাঁসর সকালে সন্ধ্যায়
বাজাই তো ঠিক ; জন্মতিথি মৃত্যুতিথি এলে ।
অনেক ফুলে-ভরা সাজি সমাধিতে উজাড় করে ঢেলে
স্মরণ করি সাড়ম্বরে—কম কি কিছু করি ঃ
মাটি থেকে তুলে তোমায় মন্দিরেতে ধরি ।

সত্যি কথা বলি ঃ
নেই আমাদের সেই সাধনা, তোমার পথে চলি ;
'আমার জীবন আমার বাণী'—বলার মত শক্তি কোথা পাই ঃ
পথ চলি না, কথার ফানুস শূন্যেতে ওড়াই ঃ

তোমার সে পথ জ্বলছে । তবু জ্বলবে ঃ
আসবে পথিক (কবে, কখন !) তোমার পথে চলবে ।

প্রতীক্ষা-বিলাস

কেন যে বসে আছি, কিসের আশা নিয়ে ঃ
তবুও বসে আছি, তবুও বসে আছি।
কী চাই কার কাছে, কারো কি কথা আছে
এখানে আসবার, আমার এ নির্জনে ?
সে কথা জানিনাতো, কারেও ডাকিনি তো ঃ
তবুও বসে আমি, তবুও বসে আছি।

অজানা কেউ যদি হঠাৎ এসে পড়ে,
অবাক ক'রে দিয়ে ডাকে সে নাম ধরে,
তবে তো বেশ হয়, তবে তো বেশ হয়।
মুখের পানে তার অবাক হয়ে চাই ;
সে আছে কাছে, সাড়া দিতেই ভুলে যাই ;
দুজনে মুখোমুখি যদিও চেনা নাই ঃ
তবে তো বেশ হয়, তবে তো বেশ হয়।

এমন হয় নাকি ?—এ শুধু কল্পনা,
অলস মগজের খেয়ালী জাল বোনা।
কেউ তো আসবে না, কেউ তো ডাকবে না ;
দিনের পরে দিন শুধুই দিন গোনা—
জানি তো পথ চাওয়া মিথ্যে অকারণ ঃ
তবুও বসে আছি।

শান্তশীল দাশ

বৈশাখী

একটি নির্জন রাত, তারা-ভরা একটি আকাশ ঃ
কোথায় হারিয়ে গেল, খুঁজে তার পাইনে আভাস।
কত না রাত্রি আসে, চেয়ে থাকি আকাশের পানে ;
ঝিঁ-ঝিঁ-ডাকা ঝাউ বনে সে-আঁধার কোথা গেল ?
কোথায়, কে জানে !
আঁধারের সেই সুর আর তো বাজে না ;
জোনাকীরা আর কই আঁধার রাতের বুকে বাসর জাগেনা !

সে-রাত হারিয়ে গেছে মানুষের ভিড়ে ;
সে-আকাশ অবসন্ন তীক্ষ্ণ, তীব্র আলোর তিমিরে।
মানুষের ভিড়ে ভিড়ে রাত কোথা ! দিনের বেদনা ;
শুকনো পাতার নিচে ঝিঁঝিঁদের কবর রচনা।
ঝিক্‌মিক্‌ মালাখানি জোনাকির ঝড়ে উড়ে যায়,
(কোথায়, কোথায় !)

সেই রাত, সেই সেই তারা-ভরা একটি আকাশ ঃ
মিলবে কি কোনদিন ? তবু তাঁরে খুঁজে ফেরে
বৈশাখের দুরন্ত বাতাস।

আমার আকাশ

স্নিগ্ধ শ্যামল একটি বিকেল ঃ সন্ধ্যার কোল ঘেঁসে
যদি আনমনে পথভুল করে হেথায় দাঁড়াতো এসে,
আমার এ ছোট নির্জন বাতায়নে ঃ
কেমন সে হ'ত ভেবে পাই নাকো ; তবু আমি ক্ষণে

সেই কথাটাই ভাবি, বেশ লাগে ঃ সকাল সন্ধ্যাবেলা,
মনে মনে সেই সুরটুকু নিয়ে কতই না করি খেলা।

পাশের বাড়িতে শুনি প্রতিদিন চীৎকার ভেসে আসে ঃ
অসম ছন্দ জীবনের নীলাকাশে
রুক্ষ রৌদ্র ঝরে ;
সেই রৌদ্রের তাপে বিশুষ্ক কঠিন মাটির ’পরে
কোন কিশলয় জাগে না,—শুকনো পাতার আর্তনাদ ঃ
বাতাসের বুকে ছিন্ন-তারের কী করুণ অবসাদ !

আমার এখানে তবু সবুজের প্রসন্ন হাতছানি,
আমার আকাশে সজল মেঘের স্নিগ্ধ আশীর্বাণী।

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি
(১৯২২)

আরোগ্য

আলোর শুশ্রূষা দিয়ে এ পীড়িত জীবনকে তুমি
সুস্থ করে নিয়ে যাবে কোনো দূর শুভ্র ভূমি তটে—
এই আশীর্বাদ দিয়ে, হে আকাশ আমাকে বাঁচাও ;
আমি মুক্তি চাই জেনো, আরোগ্যের আলোর নিকটে
আমিও উত্তাপ চাই, সমর্পিত সুস্থ দেহ, মন,
যে আমাকে ভালোবাসে তার কাছে ফিরব এখন।

অন্ধকার ঢেকে গেলে কারা যেন ধীর পায়ে আসে
স্মৃতির গুণ্ঠন নিয়ে, ঘিরে বসে, কথা কয় তারা,
রাত্রির বিছানাটুকু ভরে যায় সে কথার গানে
নির্জন চোখের দিকে তুলে ধরে গোপন ইশারা।
কতো যে আশ্বাস আনে, 'শান্তি দেব, প্রেম দেব,—প্রাণ'—
আমাকে চঞ্চল করে অশরীরী এসব আহ্বান।

ঘুমের দিগন্তে ঢাকে অতন্দ্রিত স্মৃতির বেদনা,
কী এক নিঃশব্দ মোহ সে মুহূর্তে আমার জীবনে
সঞ্চারিত হয়ে ওঠে আনন্দের সমুদ্র বিলাসে,
আমি স্নান করে উঠি অনুভবে সারা দেহে মনে
ফিরে পাই নব জন্ম, এ প্রেমের ম্লান দুঃখ শোকে,
আমি ক্লান্ত পান্থ এক ক্ষণিকের ঐশ্বর্য আলোকে !

তারপর সূর্য ওঠে, রোদ আসে, স্মৃতির দূতেরা
অদৃশ্য পর্দার পারে চলে যায় ; ভোরের সান্ত্বনা

পৃথিবীকে ঢেকে দেয় অপার্থিব সকালের দানে,
আমি প্রাণভিক্ষা নিয়ে তার দিকে এনেছি প্রার্থনা।

আলোর শুশ্রূষা দিয়ে, আজ তুমি আশীর্বাদ করো
হে আকাশ সূর্য-প্রাণ, সুস্থ করো আমার জীবন,
আমি শান্তি পেতে চাই ; সব চলা শেষ হয়ে গেলে—
যে আমাকে ভালোবাসে তার কাছে ফিরব এখন।

ভোরের প্রার্থনা

অরণ্যের গন্ধ নিয়ে অদূরের শালবন হ'তে
একটি নির্জন ভোর বেজে ওঠে লাল ধূলোপথে
অন্ধকার মুছে যায়। আকাশের প্রার্থনার গান
বিছায় গমের ক্ষেতে শরতের ছুটির সম্মান।

এইতো দিনের জন্ম, চেয়ে দেখি টিলা বেয়ে আসে
পাহাড়ের রেখাচিত্র আঁকা হোলো দূরের আকাশে
নিঃশব্দ সবুজ মাঠ, ছোটো গ্রাম, সকালের আলো ;
পেলাম পরম শান্তি ; এপৃথিবী কী আশ্চর্য ভালো !

ভোরের ধ্রুপদ ওঠে। নত হোয়ে দাঁড়াই এপথে
কেন যে বেদনা পাই জীবনের কোন্ স্মৃতি হ'তে
কী গভীর অনুভবে ; তবু জানি রাতের অমৃতে
ভরেছি আমার পাত্র অন্ধকারে ছোঁয়ার সংগীতে।

একটি নির্জন ভোর পাহাড়ের অরণ্য জগতে
অনুজ্জ্বল রোদ রাখে ধূলো-মাটি-কাঁকরের পথে
এই প্রেম, এই প্রাণ, শান্তি ! শান্তি ! আলোকে ক্ষমায়
মুছে দিক্ সব গ্লানি সকালের রোদের বন্যায়।

আর কিছু নয়

দুপুরের স্নেহ নিয়ে দিবসের অবসর সব
ছড়ানো এখন পথে। এ মুহূর্তে এই অনুভব
এইটুকু পরম সঞ্চয় ঃ
আর কিছু নয়।

ঘরের উঠোন ঘিরে কতো শ্বেত করবীর সারি।
পথের ওপারে দেখি শালগাছ, ফুলে ফুলে তারি
দেহের সবুজ রূপ ডাক দেয় যৌবনের প্রতি,
চোখ মেলে চেয়ে থাকে স্তব্ধ সেই স্থির বনস্পতি,
এইটুকু ছবির সঞ্চয় ঃ
আর কিছু নয়।

দুপুরের আলো জ্বেলে আকাশের সীমা জেগে আছে,
পাহাড়ের পাণ্ডুলিপি লেখা হোলো অরণ্যের কাছে।
গভীর প্রশান্ত এই বিকেলের নীল দৃশ্যপট
সব কিছু ভালো লাগে গ্রাম-ঘর দূর ও নিকট—
এইটুকু মনের সঞ্চয় ঃ
আর কিছু নয়।

বেলা নিভে আসে ক্রমে, ছায়া নামে এখন এ-পথে
কতো ট্রেন যায় আসে, কোন্ দিকে কোন্ দেশ হ'তে
কতো যে ঠিকানা তার লেখা হোলো দূর সিগন্যালে
সব ছবি মুছে যাবে আগন্তুক আমি চলে গেলে।—
ক'দিনের ক্ষণিক সঞ্চয়ঃ
আর কিছু নয়।

ভোরের রোদ

শীতের প্রসন্ন রোদে ভরে গেছে ঘরের উঠোন।
সেই উষ্ণ ছোঁয়াটুকু সারা প্রাণে নিতেছি এখন
অঘ্রাণের ভোরবেলা, সুগভীর গাঢ় অনুভব
অরণ্য-মৃত্তিকা জুড়ে; প্রসারিত আলোর উৎসব
ধান মাঠে, পুকুরের জলে আর শিশিরে ও ঘাসে,
নিবিড় তৃপ্তির স্বাদ বিছিয়েছে কুয়াশা আকাশে।

ভালো লাগে, বড়ো ভালো! কী যেন সে দিয়েছে জীবনে
আমার মায়ের স্নেহ সেই বুঝি! সব দেহে মনে
ভরেছে অমৃত তার, আশীর্বাদ, অপার্থিব দান,
আমি যে এখনও শিশু, পৃথিবীর মৃত্তিকার ঘ্রাণ
কতো যুগ যুগ ধরে কতো জন্ম কতো মৃত্যু পারে,
আমার সর্বাঙ্গ জুড়ে রয়েছে সে আলো অন্ধকারে।

মায়ের স্নেহের মতো অঘ্রাণের এই শুভ্র ভোর
কী আনন্দ নিয়ে এল দিবসের প্রথম আলোর!

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

বিরহিণী

কখন সকালবেলা গোরু নিয়ে মাঠে গেছে চাষী
এখন দুপুর শেষ, বেলা যায় তবু সে এলো না
একথা ভাবতে গিয়ে বড়ো ভীরু বধূটির চোখ
জলে ভ'রে আসে আজ, বুকে বাজে কী যেন বেদনা।

কেননা জেনেছে মেয়ে, তার ভালোবাসার আহ্বান
মাঠের ধানের চেয়ে আজ আর নিবিড় সে নয়,
অনেক রাত্রির ছোঁয়া দিতে পারে, পেতে পারে সেও
কিন্তু কোথা ফিরে পাবে শ্রাবণের চাষের সময়।

নতুন ধানের চারা, ক্ষেতে ক্ষেতে আষাঢ়ের জল
ঢেকে গেছে সব দিকে, চাষী জানে এই তো এখন
নিড়ানি দেবার বেলা, আগাছার বাছার সুযোগ
এ কাজের মাঝখানে ঘরে যাবে সময় কখন ?

মাঠের শিশুর রূপ যে দেখেছে সে কৃষক জানে
ঘরের বধূর রূপ তার কাছে কতোটুকু লাগে
ধানের চারার গানে ঢেকে গেল পৃথিবীর মাটি
এখন বধূর প্রেমে কে অলস গৃহকোণে জাগে !

অতএব আজ এই ভালোবাসা প্রতিযোগিতায়
হেরে গেল বিরহিণী, তাই তার কালো দু'টি চোখ
ধূসর গ্রামের পথ ভ'রে দিল ছায়ার ব্যথায়
কান্না তার কে মুছাবে, নেভে যদি প্রেমের আলোক।

একটি সন্ধ্যার দান

গভীর রাত্রির মতো তোমার প্রেমের মৌন-স্তবে
আমার সমগ্র সত্তা ঢেকে দিলে অসীম বৈভবে
এ মুহূর্তে অবিশ্রান্ত নিবিড় বর্ষণে,
হে বান্ধবি, এই রাত্রি ডুবে যাক তোমার স্মরণে।

মেঘের ছায়ায় ঢাকা বৃষ্টি-ভেজা গ্রামের ওপারে
স্তব্ধনীল দৃষ্টি মেলে কী জিজ্ঞাসা খুঁজেছি আঁধারে
চেতনার অনুভবে ; শুধু মনে হয়,
এই মাঠ, নদী, মেঘ উদ্ভিদ ও তৃণের বিস্ময়
সমস্ত প্লাবিত করে তোমার অমৃতময় স্মৃতি
রবীন্দ্র সংগীত গাওয়া ছোটো ঘরে কিছু লাজ, প্রীতি
এ-বৃষ্টির সুরে সুরে আজ এই মেঘের কান্নায়
মনের মৃত্তিকাটুকু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

জীবনে এসেছে যারা, তারা এতো ভালোলাগা দিয়ে
এমন সবুজ শয্যা কোনো কোণে রাখেনি বিছিয়ে।

✓ তবে এসো, ঢেকে দাও অজস্র অরণ্য-চুলে, চোখে
তোমার দেহের দীপে উৎসারিত আনন্দে আলোকে
আমার আকাশে যত অন্ধকার আছে, সব শেষে,
পরম পিপাসা নিয়ে ডেকে নাও, কাছে ভালোবেসে।

অসীম দিগন্ত ঢাকে কী অতল মেঘের গভীরে
এখন তোমার ধ্যানে, অনুভবে, রাত্রি থাক্ ঘিরে
আমার সকল রাত্রি, অনিদ্রিত আনন্দের ক্ষণ
একটি সন্ধ্যার দানে ভরে গেছে সমস্ত জীবন।

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

উত্তরণ

বৈশাখের গতঝড়ে ভেঙে গেছে কৃষ্ণচূড়া গাছ।

পঞ্চাশ বছর ধরে অথচ সে ভরেছে আকাশ
শহরের ফুটপাত ফুলে ফুলে। সে বৃক্ষের ছায়া
এখন হারিয়ে আছে শুধু এক মৃত্যুর আভাস।

প্রতিদিন দু'টি বেলা এ পথের যাত্রী আমি, দেখি
নিষ্পত্র গাছের এই রিক্তরূপ ; শুধু মনে হয়,
সবুজ পাতাও ফুল তাই দিয়ে কী আশ্চর্য ছবি
এঁকেছিল বনস্পতি বসন্তের যৌবন সময়।

হঠাৎ আজকে দেখি সে গাছের ভাঙাদেহ থেকে
একটি সতেজ ডাল কী করে যে ফুটেছে আবার
প্রাণের উত্তাপে ভরা, প্রতিশ্রুত, নিটোল সবুজ,
বনস্পতি রেখে গেল আগামীর উত্তরাধিকার।

যেতে যেতে ভাবি শুধু কোথা সেই শেষ উত্তরণ ঃ
প্রাণের গভীরে বাজে মৃত্যু নয়, অনন্ত জীবন।

হেনা হালদার

(১৯২২)

অরণ্য-মরালকে

তুমি জীবনের বিচিত্র মানে খুঁজে,
পেয়েছ উদার বিস্তৃত পরিবেশ
আমিত ছিলাম গৃহকোণে মুখ গুঁজে,
কী ঝড় তুলেছ, সেখানেও তুমি এসে !
তোমার প্রাণের সুদূর আকাশ জুড়ে
আলো আগুনের দ্বৈত বন্যা নামে,
সে আগুনে গেলে আর এক হৃদয় পুড়ে,
কেউ জানলোনা কী করুণ সংগ্রামে,
বন্ধ হৃদয়ে করাঘাত হেনে হেনে
কী কথা শোনালে ! করে দিলে তোলপাড় !
বজ্রমণির তীক্ষ্ণ দীপ্তি এনে
মনের মিনারে জ্বেলেছ হাজার ঝাড় !
হৃৎপিণ্ডের উত্তাল পাখোয়াজে
উদ্দাম হল লহরার দ্রুত বোল্,
শিরায় শিরায় যেন নহবৎ বাজে
ব্যথার নূপুরে অন্তর উতরোল,
তুমি যে মরাল দূর অরণ্য থেকে,
ডানায় এনেছ মুক্তির সংবাদ
গৃহ কপোতীর বেদনা বুঝবে সে-কে ?
ঝরা পালকের সাধ্য বিহীন সাধ।

হেনা হালদার

প্রতিবেদন

নিজেই বেজেছ তুমি মূর্চ্ছনায় আমি পারিনি ত'
তোমাকে বাজাতে। তাই ব্যথায় পুলকে রোমাঞ্চিত
হয়েছি, যখন তুমি বলেছ আমারি মিজ্‌রাবে
তোমার প্রাণের তন্ত্রী থরো থরো যন্ত্রণায় কাঁপে।
নায়কী-কানাড়া বাজে চেতনায় অজস্র ঝংকারে
ফেটে পড়ে অনুভূতি। হৃৎপিণ্ড শতলক্ষ ধারে
বহতা অশ্রুতে ঝরে। শরীরের সমস্ত তন্ত্রীকে
মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছাহত করে দেয়। কুশলী যন্ত্রীকে
তাই তুমি ভালবাস।

আমি জানি এ তোমার ভ্রম,
ফোটাতে সুরের কুঁড়ি, এ অঙ্গুলি নয় পারঙ্গম।
নিজেই ফুটেছ তুমি, নিজেই পড়েছ ঝরে ঝরে—
সুরের বকুল বৃষ্টি করে গেছ আমার অন্তরে।

নীলকণ্ঠ

সে এক আশ্চর্য প্রেম ঘৃণার তীব্রতা নিয়ে জ্বলে
আর সেই ঘৃণা যার রোমাঞ্চ সুখের চেয়ে বেশী—
যন্ত্রণায় বিদ্ধমন ফুটে ওঠে কেতকীর দলে
কাঁটার সঙ্গীতে, তীক্ষ্ণ ব্যথায় আনন্দে মেশামেশি।

সে এক হিংস্র রাত্রি, যার ক্রুদ্ধ বিষনীল ফণা
উজ্জ্বল মাণিকে জ্বলে ; আর সেই বিষের আড়ালে
অমৃতের প্রতিশ্রুতি—তুচ্ছ করে মৃত্যুর মন্ত্রণা
—স্বপ্নের কোমল হাতে জীবনের মণিদীপ জ্বালে।

স্মরণীয়েষু

'তুমি আছ এই পৃথিবীতে'……
ঘুম ভেঙে প্রথমেই এইকথা ভোরের তোড়িতে
প্রাণের বীণায় বাজে। সকালের উজ্জ্বল ললাটে
আলোর অক্ষরে লেখা এ সংবাদ। রাত্রির মলাটে
তারার খোদাই করা জ্বল্‌জ্বলে রূপোলি এনগ্রেভে
কী করে যে ছাপা হয়! সবিস্ময়ে পাইনা তা ভেবে!
'তুমি আছ'—এই জানা কোনোদিন হবে কি পুরোনো?
সূর্য-প্রদক্ষিণ পথে ধরণীকে নিয়ত ঘুরোনো
যেমন হলনা শেষ, যেমন লাগেনা এক ঘেয়ে—
তেম্নি অবাধেই তুমি স্মৃতির সরণি বেয়ে বেয়ে
কর যে নিরন্ত আনাগোনা
অবিশ্রান্ত—ক্লান্তিহীন। অথচ তা' জানোনা!
'তুমি আছ'—এ উল্লাস নয় কিছু কম!
টগরের ডালে ডালে যেমন তুরন্ত সমাগম
তুর্নিবার বসন্তের ঃ ভরে দেওয়া তারা ঝরা ফুলে
তেমনি রোমাঞ্চ জাগে প্রাণে প্রাণে হাওয়ার আঙুলে
আমার ভাবনা ভরে স্তরে স্তরে তোমারি ত' স্মৃতি—
সায়াহ্নিক সূচীপত্রে যেমন রঙের পরিচিতি।

মধুপর্ক-মন

মধুপর্কের বাটি ঃ এ হৃদয় আমার হৃদয়,
করে দিলে সব মধুময়।
এ আকাশ, এ পৃথিবী ঃ তুাুলোক-ভূলোক
মধুক্ষরা হল তুটি চোখ।

সোনালী-মধুর দিন রোদে-রোদে যেন মধু ঢালে
বসুধারা মনের দেয়ালে।
নরম ঘাসের ডগা শির্‌শিরে শিশিরের জলে
ফুল-তোলা মাটির আঁচলে।

পাখীর চোখের মত আকাশের অচঞ্চল নীলে
মিনেকরা-মেঘের মিছিলে।
সবখানে আলো-আলো সোনা-গলা, হীরে-জ্বলা-দিন
কপোতের মতন মসৃণ।

সোনালী বৃষ্টির মত ঝরে পড়ে বিস্ময় অবাক
এ পৃথিবী বিশাল মৌচাক।
ফোটে ফুল কাঁটা-কাঁটা ডালে,
ফোঁটা ফোঁটা মধু জমে ঃ কোষে কোষে মোমের আড়ালে।
ফণীমনসার গাছে কন্টিকারী, চোর কাঁটা গাছে
অবজ্ঞাত আনাচে-কানাচে ঃ
সবখানে যত কাঁটা যত হুল আছে ঃ
তত মধু তত ফুল আছে।

আমারও ব্যথার কাঁটা নিতান্তই তুচ্ছ মনে হয়।
মধুপর্কের বাটি—এ পৃথিবী ঃ আমার হৃদয়।

অন্তরঙ্গ

তুমি ত' চিনেছ কলহংসীকে ; দেখতে পেলেনা ঃ
ডানা-ভাঙা এক বিহঙ্গী-মন, হলনাত' চেনা।
কলাপে প্রলাপে ছয়লাপ করে আমি তাই ঘুরি
তোমার মুগ্ধ দুটি চোখে ছেয়ে বর্ণ-চাতুরী।

তুমি চেয়ে নিলে কেশরে-পরাগে শুধু অনুপম
গন্ধের ছোঁয়া। আমি কামনার ফুটিয়ে কদম
ঝরিয়ে দিয়েছি। ঐ মন তবু হয়নি মধুপ—
ব্যর্থ আশাকে মুঠোয় লুকিয়ে থেকে গেছি চুপ।

তুমি ত' নিয়েছ রানধনু শুধু এই আকাশের
আলোর আড়ালে ঢেকে রাখা এক ধূসর মেঘের
ঠিকানা পাওনি। কান্নার রং উজ্জ্বল রোদে
ফেলেনিত' ছায়া। বিষণ্ন সুরে দিনের স্বরোদে।

তুমি দেখ্‌লেনা ভেঙে ঝিনুকের নীল-নির্মোক
কোন মুক্তোর জন্ম দিয়েছে স্বাতীর দু'চোখ।

কৃষ্ণ ধর
(১৯২৬)

প্রাণ পিপাসা

এ বাংলা দেশের আমি, এ গৌরব ঘোষণা আমার,
এ দেশ মাটির, তবু আমার এ স্বপ্ন যে সোনার।
এ দেশের রৌদ্রদগ্ধ রুক্ষদিন আমার যৌবন
এ দেশ আমার চোখে তবু আজ বর্ষার শ্রাবণ,
ময়ূর পাখির মতো কলাপে দেয় সাড়া ;
আমার জীবনে তাই সমুদ্রের সফেন ইসারা—
বিস্মিত আহ্বান আনে। গংগোত্রীর এ প্রাণ-প্রবাহ
ফসলের উজ্জীবনে পলিমাটি ভরা এই স্নেহ
বাংলা দেশেরই দান।

নীলকণ্ঠ পাখিডাকা গ্রামে
অনেক স্বপ্নের ঘুম মধ্যাহ্নে জড়ায় নিঃঝুমে
হিজল বনের প্রান্তে। জামরুল শাখায় শাখায়
ঘুঘুর অলস ঠোঁটে। কাকচক্ষু কোনো দীর্ঘিকায়,
আশ্বিনে ধানের বনে, গাংচিল ভরা বালুচরে
পদ্মা ও মেঘনার দেশ, ময়ূরাক্ষী, কোপাইয়ের তীরে
সন্দ্বীপে, সুন্দরবনে বাংলাদেশে বিশাল চেতনা,
মানুষের স্বপ্নে আনে ইতিহাস মুখর প্রেরণা।

নিশ্চিন্দিপুরের বাংলা, বাংলাদেশ বিংশ শতাব্দীর
এ দেশের গ্রামে গ্রামে মানুষের জীবনই প্রাচীর।
চোখেতে অজস্র কান্না, ইছামতী স্রোতের মতন
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বহুদূর, দৃষ্টি যায় আকাশ-যোজন।

বহু দুঃখ, অপমান, প্রতিদিন লাঞ্ছনার ঢেউ,
জীবনেরে ব্যঙ্গ করে। এ প্রাণ -পিপাসা নিয়ে কেউ
এ স্বপ্নকে মূল্য দেবে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ পরিবেশে
আশ্চর্য সকালও আসে প্রত্যাসন্ন দুর্যোগের শেষে।

সে আশা নিয়েই আজো ব্যথাদীর্ণ হৃদয় দুর্বার,
এ বাংলা দেশের আমি, এ গৌরব ঘোষণা আমার॥

হাওয়া দাও

সব কিছু ঝরে যায়, খসে যায় বিবর্ণ প্রাচীর
মনের দেয়ালে কারা চুপি চুপি ছায়া ফেলে আসে
এ যেন বিগতনিদ্র পদধ্বনি ভোরের যাত্রীর
সুদূর দুর্গম পথে যাত্রা শুরু এ-রাত্রির শেষে।

তুমি আজ হাওয়া দাও, হাওয়া দাও নিরুদ্ধ এ-প্রাণে
এ-হাওয়ার ঘ্রাণে ঘ্রাণে কী প্রচণ্ড বাঁচার আস্বাদ
তোমার হাওয়ার মুখে শান্তি এল আশা করি গানে
মানুষেরে দাও তুমি, একমুঠো হাওয়ার প্রসাদ।

আমাদের জন্মদিন কবে ছিল, সে প্রসঙ্গ নেই ইতিহাসে
এ অরণ্যে বহুদিন বসন্তের রঙ পলাতক
রৌদ্রখরা দিন যায়, শীত আসে রাত্রির আশ্লেষে
দুর্জয় আশায় জাগে বিবর্জিত নিঃসঙ্গ জাতক।

হে বসন্ত, তুমি এসো, হে আকাশ ময়ূরের ডানা
মেলে দিয়ে হাওয়া দাও, হাওয়া দাও হে বসন্তসেনা।

কৃষ্ণ ধর

কানাগলির প্রার্থনা

কলকাতার গলিতে বাস। একতলার অন্ধকার গৃহ।
সারাদিন আলো জ্বেলে আকাশেরে করেছি প্রার্থনা :
রৌদ্র, তুমি দুপায়ে মাড়াও
স্যাঁতসেঁতে এ-চাতাল, নোনাধরা গলির দেয়াল,
চূণবালি খসা আস্তাবল—
প্রাণের স্পন্দন দাও। আমরাও দীর্ঘজীবি হই।

স্বর্গ তো করিনি আশা। অপ্সরার নূপুর-নিক্কণ
মধ্যরাতে শোনা যাবে অকস্মাৎ বসন্ত বাহারে ;
বেহাগের তান শুনে নিদ্রাহীন শয্যার আশ্লেষে
খুঁজেছি বাসবদত্তা, তোমাকে কখনো—
এ-কামনা নিতান্ত অলীক।

শুধুই প্রাণের দায়। নবজাত শিশুর রোদন।
চঞ্চল মুষ্টি যে তার ব্যর্থ হয় আচ্ছন্ন সন্ধ্যায়।
স্তিমিত মোমের আলো।
তাও তো কৃপণ। এই গৃহ অন্তঃপুরে
মৃত্যুহীন মৃত্যু-বীজ করেছে রচনা
আপন সাম্রাজ্য তার। মানুষের আছে অধিকার
কেবলি নির্বাক মৃত্যু। এ কলকাতার
গলিতে দুঃসহ এই নাগরিক দায়।
সূর্য, তুমি কেন হলে বিগত যৌবন এই বসন্তসন্ধ্যায়॥

পঁচিশ-

তুমি যদি কথা বলো

তুমি যদি কথা বলো অরণ্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে
তারার তিমির জ্বলা ডাক দেয় শাখা প্রশাখাকে।
তুমি যদি কথা বলো সমুদ্র-সৈকতে বালিয়াড়ি,
আগ্রহে চঞ্চল হয়, যদি সুর ভেসে আসে তারই।
তুমি যদি গান গাও, সে গানে বিহঙ্গ পাখা নাড়ে
তোমার কাকলী শুনে শীতার্ত বৃক্ষেরা পাতা ছাড়ে
তুমি যদি চোখ মেলো, দৃষ্টিপাতে আকাশ জঙ্গম
নয়ন ভোলানো তুমি, ক্রন্দসীর হৃদয়ে বিভ্রম।

তুমি যদি বৃষ্টি দাও, অঝোরে শস্যেরা স্নান করে
জলদ বাহন তুমি, তোমার স্নেহেতে দিন ফেরে।
তুমি যদি কথা বলো, তোমার কথায় আশাবরী
সাহানা ভৈরোঁর সুরে দোল খায় দিবস শর্বরী।
বিষণ্ণ মলিন দিনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি
সংকল্প সুদৃঢ় করে প্রতিজ্ঞার অব্যর্থ প্রস্তুতি।

সমর্পিত

বৃষ্টি তুমি বলে যাও, নরম সবুজ ঘাসে ঘাসে
স্বপ্ন ঘুমন্ত আছে, ভিজিয়ো না, মেঘের মাদলে
ঘুম ভাঙ্গায়ো না তার, ছুটি নিয়ে চলে গেছে তাকে
ডাকবে না পৃথিবীর কোনো মায়া, কোনো পিছুটান

নদী জানে তার কথা, বুকে ক'রে নিয়ে যাবে দূরে
নিরন্তর জলে ঢেকে', উৎসে কী বিস্ময় জমা আছে

কৌতূহলী তাকে চায়। অন্য জন্মে হ'বে তাকে দেখা
তখন কী করে চিনবো আকাঙ্ক্ষিত সেই দু'টো চোখ
মায়ের অশ্রুতে ভরা, টোল খাওয়া তৃণাগ্র চিবুক
নিয়ে এসো এক বুক উচ্ছলতা, দুরন্ত নির্ঝর
পরিচিত হাসিটুকু, হে রমণী, চিনে নিয়ো তারে
তোমার বুকের গন্ধ মুখে তার চুম্বনের স্বাদ,
কী ক'রে যে লুকোবে সে, জননীর যন্ত্রণার ঋণ
হে মানবশিশু, তুমি নিয়ে এসো সমর্পিত দিন।

অনন্য

জীবন ছলনা নয়, সত্য সে তো আলোকের মত
প্রভাতে মধ্যাহ্নে যারে বহুবার চেয়েছিলে মনে,
একান্ত আপন করে, সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে দেবে জেনে।
আপন হতেই সে কি আজ এসে দাঁড়িয়েছে তোমার অঙ্গনে
প্রত্যাশার বন্যা নিয়ে, প্রতীক্ষার বর্ষণের মতো ?

যারে তুমি চেয়েছিলে কর্মে আর স্বপ্নের নির্জনে,
যে কন্যার রূপযানী প্রাত্যহিক মনের মমতা,
তোমার নিঃসঙ্গ প্রাণে এনে দেবে শান্তির প্রলেপ,
তারে কি জেনেছ আজো, যে অনন্যা, কী বা নাম তার !
সে যে এল মৃদু পায়ে চপল চকিত দু'নয়নে,

হৃদয় উৎসর্গ করে। তারে নিও জীবনের গানে॥

দুর্গাদাস সরকার

(১৯২৭)

একটি গাছ একশ ফুল

ঝাপসা আকাশ তলে
নগর-চূড়া হঠাৎ এ কোন অগ্নিশিখায় জ্বলে।
সারাটা দিন ট্রামের দাপাদাপি,
তারি পাশেই শূন্য মাথায় ভর্তি ফুলের ঝাঁপি।
একটি গাছে এক শ’ ফুলের ঘর,
চৈত্রদিনে হৃদয়-কোণে তারাই আনে ঝড়!
ব্যস্ত প্রহর, সমস্ত দিন তু’ পাশে লেনদেন,
কেনা-কাটা, রিক্‌শা, অফিস, লম্বা পায়ে হাঁটা,
পথের মাথায় পুলিশ মোতায়েন,
হঠাৎ সবাই থমকে দাঁড়ায় বন্ধ জোয়ার-ভাঁটা,
এক চমকে শক্ত মনের গিঁট গেছে যে কাটা,
কোন বিধাতা এমনি করেই ফুলের আয়ু দেন!
একটি পাখি চেয়েছিল কোন সকালে আশা:
ভেজা তুটি ঠোঁটের একটি বীজে
ছড়িয়ে আছে শহর জুড়ে বনের ভালোবাসা!!

অন্তরালে

চোখ নেই বলে ভেবো না হৃদয় মৃত।
ফুটপাতে বসা সকাল বিকেল সন্ধ্যা অনাবৃত
লোকটা অনাদৃত।
সে-ই জানে ঠিক সূর্যের আসা-যাওয়া,
কখন তপ্ত রৌদ্রে উধাও হাওয়া।

দুর্গাদাস সরকার

কণ্ঠে যদিও রামপ্রসাদীয় সুর
সারাটা দুপুর, সে তবু নিরন্তর
অন্তরে শোনে আকাশ-বাজনা,
মনে মনে রঙ রাঙা মেঘ ডম্বর।

বাস যায় : আসে একটি পয়সা : আশা।
আচমকা ঠুন ঠুন
চুড়ির আওয়াজ মিলায়। হৃদয় খুন।
চোখ নেই। জাগে জীবনে হঠাৎ
ফুটপাতে ভালোবাসা
আজন্ম সঞ্চিত

চোখ নেই বলে ভেবো না হৃদয় মৃত॥

সত্তার সমীপে

তুমি স্থির সত্তার সেতারী। প্রতি ঘায়
নিজেকে বাজাও অন্তরায়।

সময়-সময়
কোনো রাগ ভুল হয়।
তবু তার সুর আছে, তারে বাঁধা তোমার হৃদয়।
আর সেই হৃদয়ের রাজা সাজে সঙ্,
তখনি সে সুখ পায় ভোলে যদি নিজেকে বরং।
একা হাঁটে। পথে বসে। গাছের ছায়ার গোল রেখা
তার স্পষ্ট চোখ দুটি ধরে রাখে একা।

আবার কখনো তারি কায়া
দোকানে ভাঁড়ের চায়ে মুখ রেখে তোলে যবনিকা ঃ
বহু আবছায়া-জীবনের। দেখে নগর-তালিকা ঃ
মৃত্যু, পণ্য, পথে জন্ম ঃ
কখনো ধমনী
চিন্তার তরঙ্গে তোলে সমুদ্রের ধ্বনি।
হয়তো তখনি
ছিঁড়ে যায় সেতারের তার,
ডুবন্ত লোকের মতো নীল জল হয় অন্ধকার,
শূন্যতায় অসহায় বাড়ায় দুহাত।
মাটি তাকে ধরা দেয় তবু অকস্মাৎ। সেতারের তার
জুড়ে যায়। খুঁজে খুঁজে জীবনের অমৃত অপার—
নিজেকে দু'হাতে করে ক্ষয়।

তুমিই সেতারী। তার গান সুর লয়।

দূরাভিসার

চুপচাপ একা দাঁড়ায় হঠাৎ জানালার একধারে,
সন্ধ্যার রঙে রাঙানো সারাটা মুখ।
আলো-আঁধারের সুরু আনাগোনা সুচতুর অভিসারে,
অজানা জগতে অজ্ঞাতে উৎসুক।

গাছের পাখিরা ভাষা হারা, শুধু ভালোবাসা ডালে ডালে,
আমি পথ চলি মেখে সে-গাছের ছায়া।
একটি তারকা কী যেন বলবে তখন সন্ধ্যাকালে,
দুই চোখে ভাসে একটি গোপন কায়া।

চঞ্চল ছবি আব্‌ছা আঁধারে জুড়ে সারা অঞ্চল,
বুকের ভেতরে আগুনের সমারোহ।
কে যেন রয়েছে, কে যেন হারালো : খুঁজেও পাই না তল,
যন্ত্রণা তাই দারুণ দুর্বিসহ।

পৃথিবী তাকেই রাখতে কি চায় এখনো সঙ্গোপনে,
স্থির সে মুখের ভাষা কাঁপে থর্‌থর্।
'কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে,'
সারা প্রান্তরে তারি কি স্বয়ম্বর।

নৈসর্গিক

ঈশানী হাওয়ার তীক্ষ্ণ তীর
অস্থির দু' চোখে বিঁধে ধূলায় ধূলায়
ভেঙ্গেছে তোমারো বুকে শিরীষের শির।

ভিখিরীর হাঁড়ি বাঁধা শিরীষ-শাখায়
ঋতুর গৌরব ছিল। পাতাঝরা কালেও রঙিন
ছিল ফুল ফোটাবার দিন,
ধোঁয়ার কুণ্ডলী, রান্না তার তলে। তবু ছিল গন্ধ-ঘেরা রাত।
নোতুন বধূর মুখে আধখোলা ঘোমটার মতো
মনে হত পাখি-জাগা প্রথম প্রভাত। আর তখন সকালে
তুমি সদ্য শৈশবের দুটি ব্যগ্র চোখে
মেখেছিলে রঙ তার। কখনো ও-মসৃণ কপালে
জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের ঘূর্ণি, অথবা মৌসুমী
কোনো শোক দিতে পারে তা' ভাবোনি তুমি।
মৌসুমী বাঁধোনি তাই, ঝড় তার করোনি ক জয়।

ছায়ার সীমায় শান্তি করেছ সঞ্চয়
সে-গাছেরি অগণন ডালের কুটিরে ভরে ফুলে ফুলদানী।
পথে তার ডালভাঙ্গা দীর্ঘ শিরখানি
হঠাৎ চৌচির জ্যৈষ্ঠ-ঝড়ে,
তুমি এলে তারি কাছে চুপচাপ অন্ধকার গোপন প্রহরে।

চমকায় বিদ্যুৎ পোড়ো গাছে। তার ঋজু দীর্ঘ ত্রিশটি বছর
স্তব্ধ ফুটপাথে। তাতে পাখিদের ভাঙ্গা বাসা। হত কাক।
টুকরো ডিমের খোলা। চূর্ণ হাঁড়ি। ঠাণ্ডা মৃত ঝড়।
তুমি দেখো, ডালে গড়া অদূরে তোমারো ভাঙ্গা ঘর।

হি হি হেসে ভিখিরীটা তোমাকেও ডাকে !!

সংগতি

তোমার আকাশ যত বড়, তত বড় কি তোমার চোখ?
সেখানে রয়েছে চন্দ্র সূর্য তারকা বৃহস্পতি।
আমার আকাশে আদি কাল থেকে একশ' রকম লোক
দেনার মাথায় হাজার কথায় খুঁজে ফেরে সংগতি।

কেউ বা খনির কয়লায় কালো সাঁওতাল সাঁওতালী,
পাহাড়ী বা কেউ—দু'হাতে যে খায় ঝর্ণার জল তুলে।
অথবা সারেঙ—জীবনটা যার ঝোলে সোজা মাস্তুলে,
তারা সমতল সবুজ দেশের মাটি চায় এক ফালি।

যে পাখি খেলছে মাটির ওপরে, তুমি তার কাছাকাছি
নদীটা দেখছো—বুকখানা তার আকাশের রঙে নীল,
সেই প্রকৃতিতে তুমিও যেমন—আমিও তেমনি বাঁচি,
এবং তাদেরো নিয়েই এবার পাবে এ-পৃথিবী মিল।

বিস্মৃত সর্ত

চমকাই আচমকা দেখে। দোতলার জানলায় দুপুরে
আমাকে দেখেই দ্রুত সরে গেল। একান্ত গোপন
কী কথা ভাবছিল একা চিন্তার চাদরে মুখ মুড়ে।
আমিই দেখার আগে সে দেখেছে আমাকে কখন !
নিতান্ত নিস্তব্ধ পথে আমি স্তব্ধ তখনো একাকী
দাঁড়িয়ে, এবং যতো মিল খুঁজি—ততোই না মিলে
গভীর সে-মুখ চোখ। জীবনের সমস্ত সংজ্ঞা কি
ঢাকা পড়ে ধীরে ধীরে হৃদয়ের দুর্ভেদ্য পাঁচিলে।

ও-মুখে প্রশান্তি ছিল। হাসির ছটায় দীপ্ত গাল।
আঙিনা নিকতো হাতে, কটি বেঁধে। আর নিতো পার্ব
আমার নিকটে। দীন আমি তার ছিলাম সম্রাট।
তারপর কৈশোর-প্রান্তে ভেদ করে' মনের পাতাল
যৌবনের বন্যা এলো। চুনি-পান্না-হীরে-জহরতে
অন্য হাত ধরে ধীরে ডুবে গেল আরেক জগতে।

চিত্তরঞ্জন মাইতি
(১৯২৭... ?)

মাথুর

ঘুঘু ডাকে দুরন্ত দুপুরে
রামায়ণ পড়ে কেউ
একটানা বিলাপের সুরে,
মনে হয় উর্মিলার মন
সুদূর অজানা পথে
কার যেন করে অন্বেষণ।

বকুল ঝরেছে কোথা
মৃদু মৃদু গন্ধ আসে তার,
তুমি নেই
এই স্মৃতি অপার ব্যথার।

তুমি চলে গেছ
আকাশের নীল তারা আজো চেয়ে রয়,
আজো নদী কংসাবতী বয়,
আঙিনায় দুটি তরু
শাখায় শাখায় তারা করে আলিঙ্গন
আমি শুধু নিঃসঙ্গ জীবন।

স্বর্ণদ্বীপে শিলাচিত্র

আমাদের মধ্যে এক দক্ষ সদাগর
কোন এক শুভলগ্নে পণ্যভার নিয়ে

চিত্তরঞ্জন মাইতি

পূর্বগামী তরণীতে পাল তুলে দিয়ে
পাড়ি দিল দুঃসাহসে দুস্তর সাগর।
মনে মনে কেটে চলে ছক
কাচখণ্ড বিনিময়ে নিতে হবে অমূল্য হিরক।

হঠাৎ হাওয়ায় এক গন্ধ ভেসে এল
দারুচিনি দ্বীপ হতে আশ্চর্য মদির
বণিকের চিত্ত হল অশান্ত অধীর
স্বর্ণদ্বীপে সপ্তডিঙা বাঁধা পড়ে গেল।
সে বণিক সঙ্গীদের নিয়ে
মায়াবতী সেই দ্বীপে একদিন গেল যে হারিয়ে।

তারপর ভ্রষ্টলক্ষ্য সেই সদাগর
তাদের স্বদেশ আর সভ্যতাকে নিয়ে
পাষাণের বুকে বুকে তুলল ফুটিয়ে
অনির্বাচ্য ইতিকথা—ভাস্কর্যে অমর।
আজ তারা শিলীভূত, শুধু এক শিল্পী জেগে রয়
তাহাদের পরিত্যক্ত কাচখণ্ড হল হিরণ্ময়।

আভাস

আসন্ন বর্ষার দিন, বর্ষা নেই
তবু মনে হয়
রিম ঝিম বৃষ্টি ঝরে ঘাটবাট
সারা মাঠময়।
কদম্ব কোমল গন্ধ ঢালে
বেলকুঁড়ি ফুটেছে সকালে।

সে কোন গাঁয়ের কন্যা
কাজলপাতির মত চোখ
চেয়ে চেয়ে দেখে মেঘলোক,
দেখে আর আপনার মনে
অনেক দূরের থেকে ভেসে আসা
কার যেন পদধ্বনি শোনে ;
মন কাঁপে চোখে নামে জল
মুখে টানে বুকের আঁচল।

সেই ছবি আমি কেন দেখি
আকাশ নির্মেঘ তবু কেন বসে বসে
বর্ষার কবিতা পড়ি, আসন্ন বর্ষার কাব্য লেখি।

আমার ঘুমন্ত মনে
সে কোন আশ্চর্য যাদুকর
হঠাৎ এনেছে দেখি
মেঘভাঙা আলোর খবর।

আক্ষেপানুরাগ

তোমারে দিয়েছি চিঠি কতদিন হল
সে চিঠির পাইনি উত্তর
সোনার জলের লেখা আমার অক্ষর
কতদিন তুমি বলেছিলে ; আমার এ মন
সেও নাকি পদ্মভরা দীঘির মতন।
সেদিন করিনি অবিশ্বাস
আশ্চর্য সত্যের মত সব মিথ্যা করেছি বিশ্বাস

চিত্তরঞ্জন মাইতি

সেদিন ভাবিনি
শুধু তারখণ্ড আমি, তুমি তায় তুলেছ রাগিণী ;
সঞ্চারীতে হঠাৎ কখন
তুমি হয়ে গেছ অন্যমন,
মাঝ পথে থেমে গেছে তোমার আলাপ
সমস্ত জীবন জুড়ে সমের আকাঙ্খা নিয়ে
আমার এ নিঃশব্দ বিলাপ।

রোদ ◦ বৃষ্টি ◦ ভালবাসা

সমস্ত হৃদয় আজ কান্না হয়ে ঝরেছে নিঃশেষে
কি পেলাম তারে ভালবেসে !
তার কাছে করেছি প্রার্থনা
সংসারের সুখ নয়, ভালবাসা শুধু এক কণা
সে কামনা রোদের মতন
ভরে দিক আমার ভুবন।
এই আশা আর কিছু নয়
আশ্বিনের নীলাকাশে
শুভ্র খণ্ড মেঘের সঞ্চয়।
আমার সে লঘু স্বচ্ছ মেঘ
কখন পেয়েছে দেখি গতির আবেগ
পার হয়ে শরতের সীমা
বুক ভরে নিয়েছে সে অশ্রুর মহিমা
আজ সারা মন থেকে রোদের প্রহর
মুছে গিয়ে শুরু হল বৃষ্টি ঝরোঝর।

আলপনা ० জলের বলয়

তুমি আলপনা আঁক
আমি তাই দেখি বসে মুগ্ধ চোখ মেলে
পাকে পাকে কত ফুল লতা পাতা
কত বৃত্ত এঁকে এঁকে চলে
তোমার আঙুলগুলি ; আমি কিন্তু জানি
ও শুধু আলপনা নয়,
তোমার মনের এক বিচিত্র রাগিণী।

একটি পাহাড়ী নদী, বুকে তার জলের বলয়
তরঙ্গের ঘূর্ণিবৃত্তে তৃণখণ্ড আবর্তিত হয়
তারপর সেই তৃণ ঠিকানা হারায়
ডুবে যায় আবর্ত ধারায়।
তোমার প্রেমের বৃত্তে
আমি সেই তৃণ চিরন্তন,
তোমার গতির মাঝে
আমার এ মগ্ন সঞ্চরণ।

সুনীলকুমার নন্দী
(১৯৩০)

ফিরে চলো

এ-শহরে মন আর নয়, নয়। মত্ত আশার হু হু সমুদ্র
এ-শহর কাঁপে সারা দিনরাত হিংস্র-লোলুপ ডুবুরির ভিড়ে—
মুক্তো তোলার কতো ছলাকলা। উত্তাল ঢেউ। এখানে ক্ষুদ্র
গানের তরণী ভাসাবো কোথায় ? শোন বলি মন, চল যাই ফিরে

প্রীতি ও প্রেমের সঞ্চয়ে ভরা ঘন মায়াময় এ-গানের সুর
বুকে তুলে নিয়ে অন্তরঙ্গ আলোছায়া দোলা মধু নিরালায়—
শান্তি-শিশিরে ভিজে বনপথে আমারি মতোন দোয়েল-ঘুঘুর
অবুঝ খেয়ালী সুরে সুর বেঁধে কুসুম ফোটানো ভোরের হাওয়ায়

গানের তরণী ভাসাবো। গানের সুর শুনে কারো চপল আঙুল
কুসুম তুলতে থেমে যায় যদি উন্মনা হয়ে, দু'দণ্ড কয়
বিমুগ্ধ বনহরিণীর মতো বিস্ময়ে চোখ ভরে আসে, ভুল
হয়ে যায় তার গৃহকাজে যেতে। তারপর শেষে বইবে সময়

হয়তো আবার গতানুগতিক জানি, তবু বলি, ঢালু পৃথিবীর
দুর্লভ এই আদি শিহরণে
উঁকি ঝুঁকি মারে সৃষ্টিনিবিড় যে-সব কোরক, পেয়েছো কখনো
লুব্ধ শহুরে ছক্‌কাটা কোণে !

মেঠো হাওয়া

অবশ ঘুমের দরজায় এসে বারবার কেগো কড়া নেড়ে যাও?
আরে কী অবাক, বকুলের ঘ্রাণ জড়ানো মাঠের ঝুরু ঝুরু হাওয়া,
তুমি এলে নাকি
শহরের এত সরু অলিগলি পথ চিনে চিনে! ঘুম-কেড়ে-নেওয়া
ভীরু স্মৃতি পাখি
তোমারি উতলা ভাবানুষঙ্গে পুরোনো দিনের কতো না খেয়ালী
নামতার সুর
তোলে। ধীরে ধীরে সময়ের ঘন কুয়াশাকে ছিঁড়ে
শিশু সকাল আর কিশোর দুপুর
উঁকি ঝুঁকি দেয়। আহ্লাদী ঢঙ্। সারা চোখে মুখে
অপরিচয়ের বিস্ময় দোলে—
দু'দিনে-ই সব ভুলে গেছে বুঝি? সাবাস, সাবাস।
মিনতি আমার এখন তা হ'লে
তুমি ফিরে যাও দূর পাড়াগাঁর পথে প্রান্তরে। সব স্মৃতিছায়া
মুছে দিতে চাই। মাতাল তুফান
ছড়াতে দেবো না অন্ধ হৃদয় বালিয়াড়ি ছেয়ে; বকুলের ঘ্রাণ
জড়ানো তোমার আঁচল বন্ধু দুলায়ো না এই ঘুমভাঙা নীল
রাতের শিয়রে, মিথ্যে ছলনা
দেখিও না আর; তুমি কি বোঝো না
ফুলদানি ভরা বাসনার বাসি ম্লান ফুলে আজ কী ব্যথা জাগাও!

থাক, থাক। আর কৈফিয়তের কোন কাজ নেই।
তোমার কি দোষ? কারো দোষ নয়।
নিয়মের বাঁধা সড়কে হাঁটতে শিখি নি আজি-ও,
আমারি তো ভুল—

'ভালবাসি' বলবার সব চেষ্টা বৃথা—
আগে জানিনি তা।
কা'রা এসে
কণ্ঠ চেপে ধরে অট্টহেসে।
সে কি লাজ?
সে কি ওই মার্জ্জিত সমাজ
আর পিছে ফেলে-আসা যত নর-নারী?

না না, শুধু তা'রা নয় প্রেমের ভিখারী;
তা ছাড়া অনেকে
আরো, চেনা-জানা নেই তাই থেকে থেকে
বলা-না-বলার দ্বন্দ্বে
থামা-ও-চলার ছন্দে
চোখ খুলতেই
দেখি তুমি নেই!
বৃষ্টি-ধোয়া কর্দমাক্ত পথে
বিদ্যুৎ-চকিত রথে
চলে গেছ যেন কত দূরে।
শ্রান্ত আমি ক্লান্ত পায়ে মিথ্যে ঘুরে-ঘুরে
ব্যর্থ মনে এই শূন্য ঘরে ফিরে আসি।

'ভালবাসি'—
ভালবাসি বলা শক্ত বড়!
লজ্জা ভয়ে দেহ-মন অতি জড়সড়,
বুক ফাটে তবু 'ভালবাসি' বলা দায়।

নব-নব রাত্রি-দিন আসে চলে যায়

রেখা দত্ত

বৃষ্টি ঝরে
অনাদি অনন্ত কাল ধরে
তার মাঝে অন্ধকারে হু হু করে নেমে আসে ঝড়,
হিয়া কাঁপে থরোথর
অশ্রু ঝরে, ঝিকিমিকি সিক্ত গাল জ্বলে তপ্ত আঁখি ;
মৃত্যুম্লান অন্ধকার ভেদ করে তবু চেয়ে থাকি
প্রিয়ে,
হয়তো আসবে তুমি প্রভাতের রাঙা আভা নিয়ে।

বৃষ্টি ঝরে—বৃষ্টি ঝরে
ঝিম ঝিম ঝিম সারাক্ষণ। রুদ্ধঘরে
একা একা বসে আমি। গাঢ় অন্ধকার
আপন আঁচলে ঢেকে নিল ত্রিসংসার।

তবুও বিস্ময়

অন্ধকার হোতে এসে
ক'দিন এ-পৃথিবীর ভালবাসা পেয়ে
ভালবেসে
নেচে-গেয়ে
পুনরায় অন্ধকারে ধূমায়িত ছুটি।
পড়ে থাকে একটি বা দুটি
ধারালো স্মৃতির চোর কাঁটা
তারপর ধুলোমাখা বেশে
নিরুদ্দেশে
অনির্দিষ্ট পথ ধরে হাঁটা!

তোমার, আমার,—বারবার
একই পথ ধরে আসা-যাওয়া ;
জীবননাট্যের মঞ্চ জুড়ে একই ঢঙে
নেচে-গেয়ে অভিনয় করা, চাওয়া-পাওয়া
দুটি মুখ একই রঙে
রঞ্জিত মুখোশ করে, আলো-কে ভ্রূকুটি হেনে হেনে
অন্ধকারে ফাঁকি দেই যবনিকা টেনে।

নির্বিকার এই মঞ্চ, এ-মহাশ্মশান
অনন্ত কালের সাক্ষী, পবিত্র-মহান—
ভোলেনা ! অন্তরে জমা পুঞ্জীভূত শোক ;
আমাদের ক্ষণস্মৃতি তাও করে যোগ !

প্রসূতি-আগারে যারা দিয়ে উলুধ্বনি
আহ্বান জানিয়েছে, যে-সব রমণী
বাজিয়ে পবিত্র শঙ্খ মাতিয়েছে পাড়া
আজকে কোথায় বলো তারা ?
যারা আজ এসেছে শ্মশানে
কে কোথায় চলে যাবে মহাকালই জানে।

চিতার আগুন জ্বলে উন্মত্ত বাতাসে,
ভিজে কাঠ, মাঝে মাঝে সব নিভে আসে।
সংসারের শত ভিজে প্রেমে এক দিন
মনের চিতাও নিভে জ্বালা হয় ক্ষীণ ;
তারপর রঙ্গমঞ্চ জুড়ে
অন্য, নব সঙ্গী নিয়ে স্বাভাবিক সুরে
সুরু হয় অভিনয়—তবুও বিস্ময় !

রেখা দত্ত

তোমায় নিয়ে

(১)

পূর্ণতাকে আনতে হলে এই জীবনে,
তোমায় আমার পেতেই হবে দেহে-মনে।

মন-মাতানো রূপে-গুণে যখন এসে
একটু ছোঁয়া দেবে আমায় ভালবেসে
তখন যদি মৃত্যুও হয়—সানন্দেই
বক্ষে নেব তোমায়, তাকে—এক সাথেই,
সেই শুভদিন আসবে কবে? জীবন-শেষে—
'আমি তোমার, তুমি আমার'—বলবে এসে।

পূর্ণতাকে আনতে হলে এই জীবনে,
তোমায় আমার পেতেই হবে দেহে-মনে।

(২)

বলছি, সরো! স্পর্শ তোমার অসহ্য আজ,
তোমায় নিয়ে পণ্ড হল সমস্ত কাজ!

চিলের মত উড়ছিলে তো দূর-আকাশে;
তেমনি আবার বেড়াও উড়ে! প্রেমের পাশে
বাঁধতে আমি চাইনে তোমায়—সুস্থ মনে
আগুন নিয়ে খেলতে কে চায়? অকারণে
দুঃখ দিয়ে, দুঃখ পেয়ে কী সুখ আছে?
এ-দুঃসহ জ্বালায় জ্বলে মানুষ বাঁচে!

বলছি, সরো! স্পর্শ তোমার অসহ্য আজ,
তোমায় নিয়ে পণ্ড হল সমস্ত কাজ।

(৩)

তোমায় ছাড়া দুঃসহ এ-জীবন ভার;
হায়রে, আমার করার কিছু নেই তো আর।

ওই তো তোমার কাপড়-জামা কুঁচিয়ে রাখা,
বই-খাতা আর কাগজ-কলম—গন্ধ-মাখা
আজ অবধি প্রতিটিতে। অনেক দূরে,
কখন আমার এ-ঘর ছেড়ে গেছ উড়ে
অলক্ষিতে! এখন ভাবি—ঘর গুছিয়ে
কী হবে আর? বসত করব কাকে নিয়ে?

তোমায় ছাড়া দুঃসহ এ-জীবন ভার;
হায়রে, আমার করার কিছু নেই তো আর॥

না-বলা কথাটি

কঠিন যে-কথা বলা, তা-ও বলা হয়ে গেল আজ;
কি করে সম্ভব হ'ল জানিনে তা, দুর্বল সমাজ
যেখানে পিছিয়ে পড়ে সে-থেকেই যাত্রা হ'ল শুরু
সংস্কার-আবদ্ধ প্রাণ মিথ্যা ভয়ে করে দুরু-দুরু।

সত্যের অমূল্য মূল্য চিরদিন তুমি প্রভু দাও;
মিথ্যাকে ভাঙার মন্ত্র তুমিই তো সর্বদা শিখাও
এবং আমাকে ক্ষমা করে থাকো—এ-চির-আশ্বাসে
না-বলা কঠিন কথা বলা হয়ে গেল অনায়াসে।

তুমি যে মহান্ তাই হাসিমুখে নীচে নেমে এসে
অন্ধকারে হাত ধরে নিয়ে যাও আলোকের দেশে,
তুমিই অভয় দাও, দাও প্রাণভরা ভালবাসা
যে-লোভে সংসার মাঝে বারে-বারে ঘুরে-ফিরে আসা।

সুতরাং দেহ-মন তোমার প্রসাদে হ'লে খাঁটি,
স্বাভাবিক ভাবে বলি ভয়ানক না-বলা কথাটি॥

বিদেশী সৈনিক

ফেরার পথে পুন আসবে এখানে সে—
এ-কথা বলে গেল অজানা দূরদেশে :
ক্লান্ত পায়ে-পায়ে রক্ত-স্মৃতি রেখে
কেবল পথচলা যুদ্ধ-ভীতি এঁকে!

ফেরার দিন হল তবুও আসেনা সে,
ঘুমিয়ে পড়েছে কি একাকী পরবাসে?
অথচ জীবনের সবটা সুধাই তো
সে কেড়ে নিয়ে গেছে, ফিরিয়ে দেয়নি তো!

যুদ্ধ শেষ হল, যে যার দেশে ফিরে
গিয়েছে। আজ নানা পাখীর ডানা ঘিরে

আগেরই মত ম্লান-গোধূলি আকাশের
শুভ্র নীরবতা এ-গাঁয়ে নামে ফের !

বিদেশী সৈনিক তবুও আর আসেনা ;
ক্ষণিক-খেলাছলে আমি যে তারই কেনা।

লেখা লেখা খেলা

আমার জোনাক মনে যার স্মৃতিখানি
টিপ্ টিপ্ জ্বলে-নেভে—জানি
সে শুধু আকাশে ফোটে, ছিঁড়ে আনা দায়
তবু কেন তাকে প্রাণ চায় !

ভুল-ভাঙা প্রতি প্রাতে চলে এলে ফিরে
অন্তরের অনন্ত গভীরে
সে কেবল চোখ টিপে হাসে অকারণে
মিটিমিটি তারা-ফুল বনে।

রাত নেই, দিন নেই তাই
লিখে যাই, লিখে যাই, লিখে রেখে যাই
বারংবার তার ও আমার
পূর্ণ-রিক্ত ইতিহাস হাসি কান্নার।

সে কি এসে পড়বে কভুও
এ বেদন-লিপি ? তাতো জানিনে ; তবুও
কর্মহীন দীর্ঘ সারা বেলা
একমনে খেলে যাই লেখা লেখা খেলা ॥

মৃণাল দত্ত

(১৯৩৮)

তৃপ্তি

সমর্পণে ক্ষান্তি নেই ; যে-আধার খুঁজেছে প্রেমিক
বারম্বার পূর্ণ হোল সেই পাত্র। ঘুরে ফিরে তার
বাসনা-ক্রন্দসী মন স্থির লক্ষ্যে ফেরা হোল সার।
দৈবভাগু পেলনা সে ঃ নিরত্যয় প্রেম-মন্ত্রে ধিক্ ॥

পৃথিবীর সব পাত্র পূর্ণ হোল ; মেটেনি পিপাসা
একবিন্দু ; অবশেষে অনির্বেদ প্রার্থনায় ঢেলে
দিল সে সমস্ত প্রেম ঈশ্বরের অকৃপণ হাতে।
আকাঙ্ক্ষা সুতৃপ্ত হোল, সেই খণ্ডদৃষ্টি মুছে ফেলে ॥

ছোঁয়া

একবিন্দু ছোঁয়ামাত্র সমস্ত যৌবন তার ভেঙে গুঁড়ো হোল।
আমি ব্যর্থ হাহাকারে ভরিয়ে তোলার আগে যন্ত্রণার ঘর,
তার মৃত্যু চেয়ে চেয়ে দেখেছি। বিমৌন আঁখি মেলেছি নীরবে
উদ্বিগ্ন সঙ্কেতে। মৃত্যু কম্প্রহাতে তুলেছি এ-উদ্বৃত্ত প্রহর।

এটুকু পরম প্রাপ্তি সভয় আঙুল তুলে স্বরচিত মনে
বারবার নিষেধাজ্ঞা মেনেছি—পুষ্পিত-বিন্দু কখনো ছোঁবনা
দীর্ঘসূত্র স্পর্শপাতে তনুদেহে বহ্নি জ্বেলে অমেয় যন্ত্রণা
তোমাকে দেবনা। আমি দ্রুতমুখী খরতোয়া দুরূহ দহনে

এখন নিজেকে জ্বালি। সঞ্চিত বেদনাগুলি একান্ত আঁধারে
অনন্য মুহূর্তে দীপ্র। নির্জনতা মূর্ত, ভীত তুরন্ত নির্ঝর।
শিখা জ্বালিয়েছি; আমি সম্মোহে বেঁধেছি বুক পরম তুর্বারে,
পারিনি, ছুঁয়েছি মাত্র দীর্ণ হাহাকার ছিঁড়ে নিরন্ত নির্ভর

সমস্ত যৌবন তার ভেঙে গুঁড়ো হোল। এক চটুল হরিণী
অন্ধবেগে ছুটে গেল, হৃদয়ে বেজেছে তার সুতীব্র শোহিনী।

জন্মদিন-মৃত্যুদিন

অন্ধকার কালো বলে পৃথিবীর দিনগুলি অনন্ত আলোয়
উদ্ভাসিত; সময়ের অকৃপণ প্রশান্ত-প্রণম—
অন্ধকার ভালো বলে আমাদের দ্রুতগতি মেয়াদী জীবনে
জন্মদিন-মৃত্যুদিন নদী আর সমুদ্র-সঙ্গম।

তবুও সঙ্গম থেকে উৎসারিত কেন্দ্রবিন্দু নিয়ে চলে যায়
স্বগত ইচ্ছার বৃত্তে; কৈশোরের আশীর্ণ সরণি
বেলাভূমি ছুঁয়ে যায়; আরেক-বার পরিত্যক্ত অনচ্ছ শৈশবে
ফিরে যেতে ইচ্ছে করে।

চিরন্তন কালের পাটনী
যদিও সঙ্কেত করে নিঃশব্দ তুয়ার প্রান্তে তথাপি বিলাপে
বঞ্চিত করার চেয়ে জন্মলগ্ন ফিরে পাই ভৈরবী আলাপে।

একটি অনুভব

অস্থির রেখায় সব নিষণ্ণিত, তরঙ্গিত জল
চক্রাকারে দীর্ঘ হয়, ইচ্ছার বলয়ে কেঁপে কেঁপে
অদূরে বিলীয়মান সবুজ নারীকে অচপল
মৃত্তুস্পর্শে ছুঁয়ে যায় অতর্কিতে ; পা মেপে, পা মেপে
উৎসে ফেরে পুনরায়।

যে-হৃদয় জন্মে বারবার
কে সেই নিষঙ্গী, যার নীড়লক্ষ্যে নিদ্রিত শিরায়
তীব্র অনুভব ছোটে, আকাঙ্ক্ষা-উন্মত্ত পারাবার
তবু মোহনায় কিছু শীকরবিন্দুই রেখে যায়।

বৃথাই নির্জনে তবে অনঙ্গের মূঢ় ক্রীতদাস
সেজে থাকা নিরন্তর। নিঃশব্দ মুহূর্ত-সহবাস
অনৃত ওষ্ঠের সীধু পানে ব্যস্ত বিমূর্ত উজানে
অলক্ষে অদৃশ্য হয়, একমাত্র অন্ধকার জানে।

সময়ার্ত

অন্তরীণ বন্দী পাখি। লৌহ-শলাকার প্রতিবাসী
অনন্ত আকাশ তাকে নিরন্ত ডেকেছে—পাশাপাশি।

অনার্তবা এক নদী। অনুৎসারিতের গুপ্ত-রতি
অতর্কিত বেগবন্ত—অন্ধকারে মূর্ত ঋতুমতী।

আত্মজা কুমারী এক। অনির্ণীত যৌবনের হাতে
স্বগত-ইচ্ছার প্রার্থী—সময়ের ধূর্ত শরাঘাতে॥

মৃদুলা রায়

(১৯৩৯)

শতবার

ঈগলের ডানা বাজে। পাহাড়ের গোড়া থেকে চূড়া
ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত সেই গহ্বরে-গহ্বরে, সেই পাষাণের
কুট্টিমে, দেয়ালে
সেই মৃদু টেনরের অকস্মাৎ নীলজোড়া সোপ্রাণো প্লাবনে
পৃথিবীর মন্দিরায়, শাঁখে প্রাণ গুরু-গুরু ঃ
তবে কী ভুলেই গেছি মকর-আরূঢ়া
গঙ্গায় সংক্রান্তি-স্নান, সমুদ্রযাত্রার ধ্বনি বাজে না কপালে!
কী দেবার কথা ছিলো! আর আজ কি এনে শ্রাবণে,
বৈশাখে গম্ভীরা ভান শুরু করি! বাজ কই বাজে
বুকের বিদ্যুৎ-শিরে, কই তারে আসল ঘা লাগে!
লাগসই মুখস্থ বোলে স্টেজে মেরে দেব নাকি সব?
সে আকাশ-ঐকতানে ক্যানেস্তারা লাগবে কোন কাজে?
এমন কি সে-জ্যোৎস্নাও, দক্ষিণাও আজ যোগে-যাগে
দায়-সারা গায়ে লাগাই; করতলে বর্ষার বৈভব

আমলকির মত চাই। তবু বাজে ঈগলের ডানা।
বিশাল রেকর্ড থাকলে : নিশপিশ ঃ শোনে না সেখানা!

মানা

বুঝি এই লেখা ধরাই দেবে না চোখে—
ভুল বাগানের মত
যেন উবে যাবে চাপা ফাল্গুন-শোকে,

পলাশের পথে নীল বৈদেহী লোকে
হবে দূর অপগত।
পাৎলা পর্দা হাল্কা লতায় ভরা
স্বপ্নের ঘোরে ঝরে
হাওয়ায়-হাওয়ায়; এই লেখা রং-করা
কিছু শূন্যের হেলা-ফেলা দিয়ে ধরা;
রবেনা একটু পরে!
এ-লেখা বাতাসে জলের আঁচল ছুঁয়ে
ঝিলমিল ক'রে এখুনি পড়বে নুয়ে।

বনবেলায়

ওঠো ঢেউ। বিজন বেলাভূমিতে
নেই কেউ। তারায় রাত বিভোর।
রাত বয়। পবনে মর্মরের
পাতা ওড়ে। বিহ্বলতার ঘোর।
ভালোবেসেছি। তা টের
পেয়ে গেছে। ভাবনা দেয় ভ'রে
চুপি চুপি। তোমার ঝুমঝুমিতে
বাজে রাত। তোমার কত সাগর!
ওঠো ঢেউ। একলা এই এলাম
এ-হাওয়ার। বাজাও বেলা ফেনিল
রূপ-ঝরা। ওই তো বাজে সে-নাম।
প্রাণ আমার, এ-মিল
তুলে নাও। মুখের কথা ঝ'রেই
গেছে সব। এখন ঢেউ জাগর॥

রমাপ্রসাদ দে

(১৯৪২)

ঝিল

শিশির-সকাল,
জলের সবুজে আর ফেললো না
ঊষার তন্দ্রাজাল।
আলো-ঝিলমিল
ঝিলের অথৈ জলে নিয়ে এল
রূপের মিছিল।
আমি একা বসে আছি কূলে,
অবাক ঝিলের জল উঠে দুলে দুলে,—
কেঁপে ওঠে ঝির্‌ঝিরে রেশ্‌মী হাওয়ার মত
রূপসীর মুখখানি লজ্জায় আনত।

নীলাকাশ টুক্‌রো টুক্‌রো ভেঙে পড়ে জলে :
জলের অতলে
মাছেরা সাঁতার কাটে : উড়ে যায়
একঝাঁক পাখি যেন অদৃশ্য ডানায়
রাতের স্বপ্নলোকে :
এ বড় অবাক লাগে
চোখের পলকে
আমি যারে দেখে নিই :
তারও কাছে,
রূপ আর রহস্যের এত ঢেউ আছে।

এ এক অবাক মেয়ে—

কার প্রতীক্ষায়,
অংগে অংগে নীলশাড়ি স্বপ্ন জড়ায় ?
জেগে থাকে,
রহস্যের দীপ জ্বেলে ইশারার ফাঁকে ?

একে আমি জেনেছি তো ঃ
আমার হৃদয় থেকে জল ঢেলে দিলে···
এ-ঝিল সবুজ হ'লো, নীল হ'লো
অপরূপ মিলে।
আমার হৃদয়ে তার খুলে দিলে খিল—
সে আজ বেরিয়ে এলো
পৃথিবীর রূপকন্যা—অপরূপ ঝিল।

শুভ্র অন্ধকারে

নূতন সূর্য দেখা দিলে পর নূতন চেতনা এসে
হৃদয়ের তটদেশে
কী গান যে গেয়ে যায়—
বুঝিনাতো কিছু এমনি উদাস সুর-ভাঙা বরিষায়।

আকাশের সোনা গ'লে গ'লে পড়ে সবুজ ধানের শিষে
সবুজে সোনায় একই সুর শোনা যায়
কথা তার তবু না-বোঝার সুরে সুরে,
চলে যায় বহুদূরে।
নদীতীরে জল করে ছল ছল
স্বর্গ-সুরভি মেখে নেমে আসে লক্ষ ঢেউয়ের দল—
অনন্ত দোলা লেগেছে ওদের প্রাণে
অনন্ত প্রাণ মুঠো মুঠো বয়ে আনে।

কোনদিন ওরা আর বুঝি থামবে না—
এই জগতের ক্ষীণ বীণাটিতে সুর আর সাধবে না।
এই সেই নদী কতদিন সেতো গ্রীষ্মের বালুচরে
হৃদয়ের ব্যথা মরুর তৃষায় জানাতো নীলাম্বরে।
আজ হিয়া তার উছল ধারায় মেতেছে এ কোন্ গানে
কোন্ বাঁশরিয়া ডেকে গেছে তারে অসীমের সন্ধানে।

আকাশ প্রদীপ নিভে গেলে পর আবার বৃষ্টি নামে—
কে যেন কী চিঠি ব'য়ে ব'য়ে আনে কেমন রঙিন খামে।
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর
বাজে কি আমার প্রাণের নূপুর
সে এক অবাক গানে,
চেনা অচেনার তানে।

চেয়ে দেখি দূরে মনের মুকুরে গোধূলির ইতিহাসে—
কার যেন ছবি ভাসে।
বরিষার রূপ ছেয়ে,
সে ছবি কবে তো মুছে গেছে হায় ঠাকুমার কোল বেয়ে।
তবু কেন আজ মনের গহনে রিম্‌ঝিম্ সুর-তানে,
সুপ্ত আমার জোনাকিরা ফের কী আলো জ্বালিয়ে আনে:
শুভ্র অন্ধকারে—
আলোটি তাদের জ্বলে জ্বলে ওঠে, নিভে যায় বারে বারে।

এই মাঠ

ঊর্ধ্বদিকে তাকাবার নেই অবসর,
তাই এই মাটির ভিতর

চেয়ে আছি : দেখছি আকাশ
নীল হয়ে বহুদূর চলে যেতে চায়,
জল জমা এই ছোট মাঠের সীমায়।

এই মাঠ
অনেক শীতের দিনে কপালে জোটেনি যার সবুজ ঘাসের
ছেঁড়া কাঁথা,
অথবা গ্রীষ্মের দিনে পিপাসার জল ;
আজ তার বুকে টলমল
আকাশের দেহ আর মন,
আজ তার চোখে দেখি সবুজ স্বপ্নে গড়া আমারি জীবন ॥

ছায়াছবি

হৃদয়ের আরও কাছাকাছি
উড়ে আসে একঝাঁক বুনো মৌমাছি।
গুণ গুণ গুণ
ঝোপ-ঝাড় ফুলবনে চুপি চুপি ছড়ায় আগুন
আধো-হাসি জোনাকির জ্বলে ওঠা প্রদীপের মত।

রাত্রি এখন কত ?
আমার জাহাজখানি পেয়েছে কি তটরেখা ?
ঝিকিমিকি জোনাকির আলপনা—লেখা ?

সে লেখাও মুছে যায়। বন্দর আরও দূরে হাসে ;
এবং সূর্য ওঠে নীলসোনা পূবের আকাশে ॥

॥ কবি পরিচিতি ॥

সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত—

ইতিপূর্বে দু'টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, "দূরান্তিক" ও "সোহিনী"। দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনায় নিযুক্ত। একজন বিশিষ্ট আধুনিক কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত। ইনি মূলতঃ প্রকৃতির কবি, নিখুঁত ছন্দ ও পরিচ্ছন্ন ভাষা নিয়ে কবিতা লিখে সুনাম অর্জন করেছেন।

সুনীল চট্টোপাধ্যায়—

প্রথম কাব্যগ্রন্থ "নাবী ফসল"। অধুনালুপ্ত "ছায়াপথ" সাহিত্যপত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। সমসাময়িক অগ্রজ কবিদের প্রভাবমুক্ত কবি। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে জীবনের গভীরতম আনন্দ-বেদনাগুলিকে কবিতায় রূপ দেওয়ার ভাস্কর্যময় শিল্পনৈপুণ্যে সিদ্ধকাম। এঁর কবিতায় যে ঋজুতা, ব্যক্তিত্ব এবং শব্দ-সংগীতের আশ্চর্য মিলন চোখে পড়ে, তা বর্তমানের অন্য কোন কবির কবিতায় অনুপস্থিত। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের কবিতার সাধনা অবিচ্ছিন্ন, আন্তরিক এবং আত্মবিশ্বাসের কঠিন দীপ্তিতে পূর্ণ। শব্দ ও ধ্বনির উপাদান নিয়ে কবিতার মধ্য দিয়ে মানব চৈতন্যলোকে প্রবেশ করার অনায়াস ক্ষমতা এঁর আয়ত্তাধীন; এবং এই সূত্রে দেশের 'মিসটিক' সাধনার স্বরূপ এঁর সাক্ষাৎকৃত। দুঃসাহসিক, বিচিত্র প্রতীক ব্যবহার এঁর কবিতাকে অনেক সময়েই বিপরীতমুখী ব্যাখ্যার বস্তু করে তোলে। সেজন্য, সম্পূর্ণ উপলব্ধির জন্য পাঠকের প্রয়োজন, এঁর প্রতীক ব্যবহারের ধারা হৃদয়ঙ্গম করা। একজন উৎকৃষ্ট কাব্য সমালোচক হিসেবেও ইনি সমাদৃত।

শান্তশীল দাশ—

"জীবনায়ন," "পরিক্রমণ," "প্রণাম তোমায়" ও "একটি প্রসন্ন সুর"— প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। অধুনালুপ্ত, "নব্য বাংলা" পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক,

"পরিবেশক" পত্রিকার সম্পাদক ও "বাঙলা ও বাঙালী" পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক ছিলেন। একজন নির্জন কবি, কবিতার মধ্যে দুর্বোধ্যতা এবং জটিলতার আবরণ নেই, যা উপলব্ধি করেন, তা সহজভাবেই প্রকাশ করেন। এঁর কবিতায় সত্যি একটি প্রসন্ন সুর ধ্বনিত।

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি—

"আবাদ" এবং "গ্রাম নদী বন"—দুটি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। ভিন্ন রুচির, ভিন্ন প্রকৃতির কবি। নিপুণ সাংবাদিক। কবিতা ছাড়াও সম্পূর্ণ আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন বাংলা গদ্য রচনায় এঁর বৈশিষ্ট অনন্যসাধারণ। ইতিপূর্বে বিভিন্ন বিদগ্ধ পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ওপর এঁর বহু চিন্তাশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত এবং উচ্চ প্রশংসিত। নির্জনতা-অনুরাগী, আত্মসমাহিত কবি, যাঁর কবিতায় বাংলার গ্রাম, মাঠ ও শস্যের গান; মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের আনন্দ-বেদনার গান বেজে উঠেছে। প্রকাশভংগী সংগীতময়, সরল অথচ আংগিকে আধুনিক। তা বলে দুর্বোধ্যতার অত্যাচারে উৎপীড়িত নয়। ঠিক যে সময় প্রকৃতি তরুণ-কবিদের কবিতায় প্রায় অপাংক্তেয় হয়ে উঠেছিলো ইনি সেই রুক্ষ সময়ে এঁর বহু কবিতায়, বলা যায়, গ্রাম প্রকৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটানোর সহৃদয় ব্রতে নিজেকে নিযুক্ত রেখে এক অনন্যসাধারণ উদাহরণ স্থাপন করেছেন। ইনি একজন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। রবীন্দ্রসংগীতের একনিষ্ঠ সাধনা এঁর কবিতাকেও এমন এক স্নাত, স্মিত শুচিতায় বিমণ্ডিত করেছে যা বর্তমান বাংলা কবিতায় দুর্লভ।

হেনা হালদার—

প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "মগ্নমন"। বহু পত্রিকায় ইনি কবিতা লিখে থাকেন। বাংলা দেশ থেকে বহুদূরে থেকেও ইনি নিরবচ্ছিন্নভাবে কাব্য সাধনা করে চলেছেন, যা উল্লেখযোগ্য। সহজ সুরের, সহজ আঙ্গিকের এবং আন্তরিকতার আলোকে এঁর কবিতাগুলি উজ্জ্বল। বর্তমান অগ্রণী মহিলা কবিদের মধ্যে স্বপ্রতিভায় ইনি অন্যতমা। ঐশ্বর্যময় নারীহৃদয়ের যে অপূর্ব উন্মোচন এঁর কবিতায় সাক্ষাৎকৃত তা আধুনিক বাংলা কবিতায় বিরল।

কৃষ্ণ ধর—

"অঙ্গীকার" ও "যখন প্রথম ধরেছে কলি"—প্রকাশিত দু'টি কাব্যগ্রন্থ। বিশিষ্ট সাংবাদিক, 'যুগান্তর' পত্রিকার সহ-সম্পাদক। কবিতা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লেখেন। জাত কবি। রাজনৈতিক সচেতনতা এঁর কবিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই সচেতনতা কবিতার ধর্মকে আহত করেনি। প্রকাশভংগী সরল, অথচ তীক্ষ্ণ। সর্বোপরি, একজন বিশিষ্ট আধুনিক কবিরূপে ইনি প্রতিষ্ঠিত।

দুর্গাদাস সরকার—

দু'টি কাব্যগ্রন্থ—"অশোকের সময়ের গ্রাম" ও "দ্বিতীয় সন্ধি"। ইতিপূর্বে "একক" কবিতা-পত্রিকায় সহ-সম্পাদকের কাজ করেছেন। একজন সৎ এবং প্রতিষ্ঠিত কবি। সাধনা একনিষ্ঠ, প্রকাশভংগী আধুনিক হলেও এঁর কবিতা দুর্বোধ্যতা-মুক্ত। জীবনবোধের গভীরতায় কবিতাগুলি উজ্জ্বল ও রসোত্তীর্ণ।

চিত্তরঞ্জন মাইতি—

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মনের রঙ' প্রকাশমান। অধুনালুপ্ত "জাতক" এবং "সন্দীপন" পত্রিকা দুটি সম্পাদনা করেছেন। বিশিষ্ট অধ্যাপক। ইতিপূর্বে দু'টি ভ্রমণ-কাহিনী লিখে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি এঁর সতীদাহ প্রথার ওপর লেখা উপন্যাস "অগ্নিকন্যা" প্রকাশিত হয়েছে। আশ্চর্য সুন্দর, সহজ ও হৃদয়ধর্মী গীতি-কবিতা লেখেন, সংখ্যায় তা সীমিত কিন্তু অনুভূতির গভীরতায় ঐশ্বর্যবান। কবিতাগুলি হৃদয়কে স্পর্শ করে, তার ঝঙ্কার—কবিতা পাঠের পরেও মনে বাজতে থাকে। এই বাউল কবির সৃষ্টিতে মূলত দু'টি সুর : একটি প্রেম আর একটি প্রকৃতি।

সুনীলকুমার নন্দী—

"অনুক্ত" পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মননশীল কবিতা লিখলেও, গীতি-কবিতার ধর্ম অনুপস্থিত নয়। কবিতায় ইনি এক বর্ণাঢ্য, চিত্রল পারিপাট্যের

সন্ধান করেন। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক প্রকরণ অনেক ক্ষেত্রেই অভিনব। এঁর কবিতা গভীর হৃদয়বেদনা-সঞ্জাত এবং এই কারণে মূল সুরটি অত্যন্ত মৃদু, অত্যন্ত ঘরোয়া। কিন্তু কখনো কখনো বঞ্চিত, অসমর্থ জীবনের গ্লানি এঁকে তির্যক্ কুটিল স্ব-সমালোচনায় প্ররোচিত করে। তখন ইনি এঁর প্রেম, সংশ্লিষ্ট অতীত ও বর্তমান, সবকিছুকেই আর্ত, প্রতীকী কশাঘাতের বিষয়বস্তু ক'রে তোলেন।

অমর ষড়ংগী—

"উৎসর্গ"—বার্ষিক সাহিত্য-সংকলনের সম্পাদক। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়। কবি সুদূর পল্লীগ্রামে থেকেও অবিচ্ছিন্নভাবে কাব্য-সাধনায় লিপ্ত। আংগিক আধুনিক। ক্ষয়িষ্ণু সমাজজীবনের নানান দিক এঁর কবিতার বিষয়বস্তু। কবিতাগুলি সহজ, সুন্দর ও আন্তরিকতা-পূর্ণ।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়—

প্রথম কাব্যগ্রন্থ "অজ্ঞাতবাস"। বিষয়-বৈচিত্র্য ও চমকপ্রদ উপমা এঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আধুনিক মননের দ্বারা প্রভাবিত; ক্রমশই অন্তর্লোকের দুর্জ্ঞেয় ভাবতরঙ্গের সুকুমার প্রকাশ এঁর কবিতায় পাওয়া যায়। নিজের মধ্যে ইনি আধুনিককালের বিক্ষোভ অনুভব করছেন এবং বর্তমান সভ্যতার গভীর নিঃসঙ্গতা, দুঃখ, নির্দয়তা ও যন্ত্রণার চিহ্ন এঁর কাব্যে প্রতিফলিত।

প্রফুল্লকুমার দত্ত—

প্রথম কাব্যগ্রন্থ "পঁচিশে বৈশাখ"। প্রথম সম্পাদিত পত্রিকা অধুনালুপ্ত "অপাংক্তেয়"। বর্তমানে "আধুনিক কবিতা" পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক। ভারতীয় সামাজিকতার গভীর অন্তর্লোকে নিজেকে নিমগ্ন রেখে, তার বিচিত্র যন্ত্রণা, আনন্দ এবং বিপুল সম্ভাবনাকে কবিতার মধ্যে নিঃশঙ্ক-চিত্তে রূপায়িত করার অচঞ্চল ক্ষমতা এঁর আয়ত্তাধীন। প্রাচীন ঐতিহ্যে ইনি আস্থাশীল, কিন্তু নিত্য-নিয়ত কবিতার নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লিপ্ত।

ছন্দের উপর এঁর অবাধ অধিকার। জীবনের সব কিছুর উর্ধ্বে ইনি কবিতাকে আসন করে দিয়েছেন। বেদনাহত হৃদয়-মন্থন ছাড়াও আত্মসচেতন এই ক্লাসিক পন্থী কবির কবিতায় একটি সুন্দর প্রেমিক জীবনের জন্য অভীপ্সা এবং সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা আছে, যে প্রার্থনা বর্তমান সমাজের সমস্ত বিদেশীয় প্রক্ষিপ্ততাকে অস্বীকার করে নতুন উদ্বোধনের জন্য প্রতীক্ষমান। মৌলিক কবিতা ছাড়াও সংস্কৃত এবং ইংরেজী কবিতার অনুবাদে ইনি সাফল্য অর্জন করেছেন।

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়—

"দূর তরঙ্গ" প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। বর্তমান বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি সম্পদময় সংযোজন। আধুনিক আঙ্গিকে, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে এবং সর্বোপরি পরম রসোত্তীর্ণতায় এঁর কবিতাগুলিকে এক-একটি নিটোল সৃষ্টি বলে মনে হবে। ইনি প্রকৃতির কবি, অন্তর্লোকের আনন্দ-বেদনাকে অতি সহজ ও সুন্দরভাবে কবিতায় প্রকাশ করার নিপুণ শিল্পী। এঁর কবিতা, পড়ার পরে পাঠককে মুগ্ধ করে রাখার মত প্রসাদগুণের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। বিষয়বস্তু-নির্বাচন, শব্দচয়ন, অংগবিন্যাস, অলংকরণ ও চিত্রকল্প-সৃষ্টির সংগে মূল বক্তব্যের আশ্চর্য মিলন এঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য।

দীনেশ মুখোপাধ্যায়—

"আধুনিক কবিতা" পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক। কবিতা লেখেন অনেকদিন থেকে কিন্তু সম্প্রতি আত্মপ্রকাশ করেছেন। কবিতাগুলি বিস্ময়কর রকমের বলিষ্ঠ। কবি সমাজ সচেতন। শব্দ-চয়নে অত্যন্ত সাবধানী। এঁর কবিতার মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে, যা ভীড়ের মধ্যেও হারিয়ে যায় না। তীব্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়ানোর শপথ এঁর রচনায়।

রমেন্দ্র মল্লিক—

"মিষ্টি মন" ও "আকাশ পিপাসা"—প্রকাশিত দু'টি কাব্যগ্রন্থ। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য সংস্থা "সাহিত্য তীর্থ"এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।

অনুভূতিশীল কবি-মনের অধিকারী এবং মূলত প্রকৃতির কবি। কবিতাগুলি শান্ত ও মৃদু সুরের। কাব্যচর্চা অবিচ্ছিন্নধারায় করে আসছেন।

নিখিলকুমার নন্দী—

এঁর কবিতায় এমন এক প্রৌঢ় মননশীলতার স্বাদ আছে যা এঁর সমবয়সী কবিদের কবিতায় অনুপস্থিত। কাব্যপ্রকরণ ও চিন্তাশীলতাকে যুগপৎ অক্ষুন্ন রেখে কবিতা রচনায় ইনি সক্ষম। সেইজন্য এঁর কবিতার স্বাদগ্রহণের জন্য কাব্যপাঠককে কিছু পরিশ্রমের সম্মুখীন হতে হয়; এবং পরে বোধগম্য হয়, সে-পরিশ্রম লাভজনক। জীবিত ও মৃত, ছোট ও বড়, কবিদের কবিতার পঙ্‌ক্তি ইনি এঁর কবিতায় স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করে প্রমাণ করে দেন, এক কাব্যভাবনার সঙ্গে অন্য কাব্যভাবনার নানা আপাতবিরোধ সত্ত্বেও অনেক সময়েই এক অন্তরঙ্গ মিল থাকা অস্বাভাবিক নয়। শব্দ চয়ন সুনির্দিষ্ট, ব্যঞ্জনাময়, বিতর্ক—আপন অভিজ্ঞতায় জারিত। "অমুক্ত" পত্রিকাটি পরিচালনা করেন।

স্বদেশরঞ্জন দত্ত —

বর্তমানের বহু তরুণ কবির মত এঁর কবিতা কেবলমাত্র এক সাজানো ব্যাপার নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে সাধ্যায়ত্তভাবে ইনি এঁর কবিতায় রূপদানের অকৃত্রিম চেষ্টা করে থাকেন। সেই চেষ্টায় নিরর্থক শব্দ ব্যবহারে একান্ত অনীহ এই কবির কবিতা এঁর উপলব্ধিকে এক নির্দিষ্টতা দেয়।

শোভন সোম—

প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থ "স্বরবিদ্ধ"। বহুদিন থেকে কবিতা লিখছেন। তাই সাধারণ পাঠক এঁকে কবি রূপেই জানেন। কিন্তু ইনি ভাল ছবিও আঁকেন। এঁর কবিতা সহজ ও সুন্দর এবং ঐতিহ্যাশ্রয়ী। শব্দধর্মের দিকে এঁর মনোযোগ বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে ইনি একজন চিত্রশিল্পীও।

সামসুল হক—

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "রোদসী"। কবিতার মধ্যে গ্রাম-জীবনের প্রতিচ্ছবি আছে। শহর জীবনের সমস্যা এবং বেদনাও অনুপস্থিত নয়। প্রকাশভংগী সহজ ও সংবেদনশীল। কবিতার মধ্যে একটি নিজস্ব সুর আছে যা কবিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য—

ছেলেদের জন্য কবিতা লিখে ইতিমধ্যে পরিচিতি লাভ করেছেন। কিন্তু বড়দের জন্যও ইনি কবিতা লেখেন, এবং ভাল কবিতাই লেখেন। সহজ, আন্তরিকতায় উজ্জ্বল এবং মৃত্তিকার স্পর্শ মাখা এঁর কবিতাগুলি মনকে মুগ্ধ করে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়—

একজন প্রতিশ্রুতিপূর্ণ তরুণ কবি। রম্যরচনা লিখে সুনাম অর্জন করেছেন। বইও লিখেছেন রম্যরচনার "দেখা অদেখা" নামে। ইনি একজন নিপুণ সাংবাদিক এবং যুগান্তর পত্রিকার সংগে যুক্ত। ইনি বর্তমানে সাংবাদিকতা সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য, বৃত্তি নিয়ে ইংলণ্ডে আছেন। সহজ ও সুন্দর কবিতা লেখেন, যার মধ্যে আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়।

রেখা দত্ত—

একজন বিশিষ্ট মহিলা কবি। প্রাত্যহিক জীবনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও, নিঃশব্দে কবিতার সাধনা করে চলেছেন। ইতিপূর্বে অনেক ঐতিহ্যশীল পত্রিকায় এঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাগুলির মধ্যে নির্জন গৃহকোণের ছবি, প্রেমের জন্য তপস্যা এবং জীবনোপলব্ধির স্বাক্ষর আছে। প্রকাশভংগী সহজ ও অনাড়ম্বর। কবিতার সমস্ত প্রাঙ্গণ ঘিরে এমন একটি নম্র আবেদন আছে, যা পাঠকের মনকে সত্যি ছুঁয়ে যায়।

মৃণাল দত্ত—

ইতিপূর্বে "কবিতা পত্র" এর সংগে যুক্ত ছিলেন। একজন প্রতিশ্রুতিপূর্ণ তরুণ কবি। অত্যন্ত সংবেদনশীল, শান্ত ও মধুর রসের সম্পদ এঁর কবিতায় পাওয়া যায়। সমস্ত কবিতার মধ্যে গভীর আন্তরিকতার ও নিবিড় উপলব্ধির সংগীত পাঠকমনকে স্পর্শ করে। আশ্চর্য মিষ্টি হাতের অধিকারী ইনি।

মৃদুলা রায়—

এঁর কবিতা এক বিশেষ আস্বাদ বহন করে। অত্যন্ত সহজে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করায় এঁর দক্ষতা এই তরুণ বয়সে সত্যিই উল্লেখযোগ্য। ভাবানুষঙ্গের সঙ্গে ছন্দের যে-ওতঃপ্রোত মিল এঁর রচনায় পরিলক্ষিত তা বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে। অত্যন্ত অল্পবয়স থেকেই কবিতা রচনায় ইনি মুনশীয়ানা দেখিয়েছেন।

রমাপ্রসাদ দে—

প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "এক পাখি"। তরুণতর কবিদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিবান।